শরৎচন্দ্রের প্রণয়-কাহিনী

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

সাহিত্য সদন
এ ১২৫ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

গ্রন্থকারের নিবেদন

শরৎচন্দ্র দিলীপকুমার রায়কে একবার এক পত্রে লিখেছিলেন—"জীবনে যে ভালোবাসলে না, কলঙ্ক কিনলে না, দুঃখের ভার বইলে না, সত্যিকার অনুভূতির অভিজ্ঞতা আহরণ করলে না, তার পরের মুখে ঝাল-খাওয়া কল্পনা সত্যিকার সাহিত্যে কতদিন যোগাবে।… সব চেয়ে জ্যান্ত লেখা সেই, যা পড়লে মনে হবে গ্রন্থকার নিজের অন্তর থেকে সব কিছু ফুলের মতো বাইরে ফুটিয়ে তুলেছে। দেখো নি, বাঙ্গলা দেশে আমার সব বইগুলোর নায়ক-নায়িকাকেই ভাবে এই বুঝি গ্রন্থকারের নিজের জীবন, নিজের কথা। তাই সজ্জন সমাজে আমি অপাংক্তেয়। কতই না জনশ্রুতি লোকের মুখে মুখে প্রচারিত।"

এই লেখা থেকে এখন বলা যেতে পারে যে, শরৎচন্দ্র নিজে সত্যিকার সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে পরের মুখে আদৌ ঝাল খান নি। তিনি তাঁর নিজের অনুভূতির অভিজ্ঞতা দিয়েই জ্যান্ত লেখা লিখেছিলেন। এবং এ থেকে আরও বলা যেতে পারে যে, তিনি ভালোও বেসেছিলেন, কলঙ্কও কিনে ছিলেন এবং দুঃখের ভারও বয়েছিলেন।

আর শরৎচন্দ্র নিজের সম্বন্ধে ঐ যে বলেছেন, "সজ্জন সমাজে আমি অপাংক্তেয়" এ কথাও তিনি একেবারে মিথ্যা করে বা অতিরঞ্জিত করে বলেন নি। জীবিতকালে তিনি এই সজ্জন সমাজের এক শ্রেণীর লোকের নিকটে সত্যই অপাংক্তেয় হয়ে ছিলেন। এ সম্বন্ধে এখানে দু একটি উদাহরণ দিচ্ছি—

এক উচ্চশিক্ষিতা, লেখিকা ও শিক্ষিকা, বর্ষীয়সী ভদ্র মহিলা এই ভূমিকা লেখার কিছুদিন আগে আমাকে এই কাহিনীটি বলেছিলেন। এই কাহিনীটি মূলতঃ তাঁরই জীবনের একটি ঘটনা। কাহিনীটির মধ্যে

ভদ্রমহিলার শাশুড়ী এবং ননদও জড়িত আছেন বলে, ভদ্রমহিলার আর নাম করলাম না। কাহিনীটি এই—

ভদ্রমহিলা নিজে লেখিকা বলে শরৎচন্দ্রের উপর তাঁর একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। শরৎচন্দ্র শেষ বয়সে বালীগঞ্জে বাড়ী করে যখন বাস করতে আরম্ভ করলেন, তখন এই ভদ্রমহিলা তাঁদের যাদবপুরের বাড়ী থেকে মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। ভদ্রমহিলা শরৎচন্দ্রকে দাদা বলতেন, আর শরৎচন্দ্রও তাঁকে ছোট বোনের মত খুব স্নেহ করতেন।

ভদ্রমহিলা প্রায়ই আসেন। একবার এসে তিনি শরৎচন্দ্রকে তাঁদের যাদবপুরের বাড়ীতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন।

নিমন্ত্রণ শুনে শরৎচন্দ্র বললেন—তোমার বাড়ীতে গিয়ে খেতে পারি, কিন্তু আমি যা খাই, তুমি তাই খাওয়াবে তো? আমি সিঙ্গী মাছের ঝোল আর ভাত খাই। তাই যদি খাওয়াতে পার তো যাই।

ভদ্রমহিলা তাই খাওয়াবেন বলায়, শরৎচন্দ্র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

ভদ্রমহিলা শরৎচন্দ্রকে যেদিন খাওয়াবেন, সেদিন সকালে তিনি বাড়ীর পুরুষদের বাজার থেকে ভাল দেখে সিঙ্গী মাছ কিনে আনতে বললেন।

সিঙ্গী মাছ এল। রান্নাও হ'ল। সেদিনটা রবিবার, কি ছুটির দিন ছিল না। তাই যথাসময়ে বাড়ীর পুরুষরা যে যার অফিসে চলে গেলেন।

বাড়ীর পুরুষরা অফিসে গেলে, এই ভদ্রমহিলার এক অল্পশিক্ষিতা ননদ তাঁর মা'র কাছে গিয়ে বললেন—ওগো মা, বৌদি কা'কে নিমন্ত্রণ করে এনে অত যত্ন করে খাওয়াবে শুনেছ! সেই লেখক শরৎ চাটুজ্যেকে, শুনেছি লোকটা যেমন মাতাল, তেমনি চরিত্রহীন। পতিতাদের মধ্যেই নাকি থাকে।

মা ছিলেন একেবারে অশিক্ষিতা, আদৌ লেখাপড়া জানতেন না। তিনি মেয়ের মুখে এই কথা শুনে একেবারে আগুন। চীৎকার করে বৌমার কাছে ছুটে গেলেন। গিয়ে বললেন—বৌমা! তুমি গেরস্থ ঘরের বৌ হয়ে একি করছ! আমি আগে যদি ঘুণাক্ষরেও এর কিছু জানতে পারতাম, তাহলে ছেলেদের ঐ মাছ কিনে আনতেই নিষেধ করতাম। কিন্তু বলে দিচ্ছি বৌমা, তুমি তাকে কিছুতেই এ বাড়ীতে আনতে পারবে না।

ভদ্রমহিলা তো তাঁর শাশুড়ীর এই কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। একেবারে অবাক্‌। তারপর তিনি তাঁর শাশুড়ীকে অনেক অনুরোধ করে বললেন—মা, আজকের দিনটার মত আপনি অনুমতি দিন। আর কোন দিন আমি তাঁকে আনব না। আজ নিমন্ত্রণ করে তাঁকে না খাওয়ালে, তাঁর যে অপমান করা হবে মা!

ভদ্রমহিলার শাশুড়ী কিছুতেই অনুমতি দিলেন না। অবশেষে তিনি বৌকে একটা মতলব বলে দিলেন। বললেন—তুমি এখনি তাঁর বাড়ী গিয়ে বলগে, আমার শাশুড়ীর ভারী অসুখ, তাই আজ আর আপনাকে খাওয়াতে পারলাম না।

নিমন্ত্রিত শরৎচন্দ্রকে শুধু সেই দিনটার জন্য একবার বাড়ীতে আনতে দেবার জন্য ভদ্রমহিলা তাঁর শাশুড়ীর কাছে কত অনুনয়-বিনয় করলেন, কিন্তু তাঁর শাশুড়ী কিছুতেই মত দিলেন না।

ভদ্রমহিলা তখন বাধ্য হয়েই শরৎচন্দ্রকে নিষেধ করতে গেলেন। তিনি কিন্তু গিয়ে শাশুড়ীর শেখানো তাঁর ভারী অসুখের কথা বললেন না। তিনি শরৎচন্দ্রের কাছে কেঁদেকেটে অকপটে সমস্ত কথাই খুলে বললেন। তিনি আরও বললেন যে, তাঁর স্বামী বা ভাসুর, পুরুষদের কেউ যদি বাড়ীতে থাকতেন, তাহলে এমনটা আর হতে পারত না। তাঁরা থাকলে তাঁদের মাকে বোঝাতে পারতেন।

অনেক চিন্তা করে তিনি নিজে, হিরণ্ময়ী দেবী, বা প্রকাশচন্দ্র কেউই নিমন্ত্রণ বাড়ীতে গেলেন না।

শরৎচন্দ্র নিমন্ত্রণ রক্ষা না করে পঞ্চগ্রামী ব্রাহ্মণ সমাজকে অপমান করেছেন বলে, সমাজপতিরা খুব হৈ চৈ আরম্ভ করলেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু কিছুই গ্রাহ্য করলেন না।

এদিকে সমাজপতিরা শরৎচন্দ্রকে ঐভাবে জব্দ করতে না পেরে আবার এক মতলব স্থির করলেন। এবার তাঁরা অন্যান্য গ্রামের লোকদের সহজেই স্বপক্ষে আনতে সক্ষম হলেন। শরৎচন্দ্র একটা বাঁধ কাটিয়ে অনেকের মাঠের ধান নষ্ট করে দিয়েছেন বলে, তাঁর নামে কোর্টে তাঁরা নালিশ করলেন। সেই মামলার ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়ে ছিল, তা হচ্ছে এই :—

শরৎচন্দ্রের গ্রাম সামতাবেড় এবং তার সংলগ্ন সামতা, গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রামগুলো ঠিক রূপনারায়ণের তীরেই অবস্থিত। রূপনারায়ণ এক সময় এই সব গ্রামের দিকেরই কূল ভেঙ্গে বয়ে যেত! এই গ্রামগুলোর পাশে রূপনারায়ণের তীর দিয়ে গবর্ণমেণ্টের যে বাঁধ গিয়েছিল, রূপনারায়ণের ভাঙ্গন ক্রমে তার কাছে এসে গেল। গবর্ণমেণ্ট তখন ঐ বাঁধ ছেড়ে দিয়ে একটু দূরে সরে এসে আবার নদীর পাশ দিয়ে বরাবর এক উঁচু বাঁধ তৈরী করাল। সে বাঁধ আজও রয়েছে।

গবর্ণমেণ্টের ঐ যে সাবেক বাঁধ, যার অধিকাংশই ক্রমে নদীগত হয়ে যায়, ঐ বাঁধ কাটিয়ে দিয়ে শরৎচন্দ্র একটি মাঠের ধানের ক্ষতি করেছেন বলে তাঁর গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের কয়েকজন মিলে তাঁর নামে কোর্টে নালিশ করে।

এই মিথ্যা মামলায় পড়ে শরৎচন্দ্র একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর বন্ধু বিখ্যাত আইনবিদ্ শ্রীবরদাপ্রসন্ন পাইনকে তাঁর উকিল নিযুক্ত করলেন।

শরৎচন্দ্র মামলার সমস্ত তদ্বির করলেও, শরৎচন্দ্রের ভগ্নীপতি

পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাহায্যে একটা সালিশি করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পঞ্চাননবাবুর আগ্রহে শেষ পর্যন্ত সালিশিই হ'ল এবং শরৎচন্দ্র সালিশিতে নির্দোষ প্রমাণিত হলেন। শরৎচন্দ্র অবশ্য পরে আর অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা বা অন্য কোনরূপ প্রতিশোধ-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি। তিনি তাঁদের ক্ষমা করেছিলেন।

এই মামলার সময় শরৎচন্দ্র সমস্ত কথা জানিয়ে তাঁর উকিল বরঁদাপ্রসন্ন পাইনকে একখানি চিঠি দিয়েছিলেন। সেটি এই :—

(১) সাবেক বাঁধ (Govt.) সরকার হইতে বাতিল হইবার পরে ইহার অধিকাংশই নদীগত হইয়াছে। স্থানে স্থানে ইহার সামান্য চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট আছে।

(২) বাঁধ abandoned হইবার পর সাধারণ প্রজার সম্পত্তিভুক্ত হইয়াছে। এইভাবে গ্রামের উত্তরদিকের হানা দফাদার শ্রীনিবারণ ঘোষালের সম্পত্তি। অতএব আমি ইচ্ছা করিলেও এই স্থান কাটাইতে পারি না। নিবারণ ঘোষাল মহাশয় তাহাতে আপত্তি করিতেন। তিনি বাদীদিগের পক্ষভুক্ত না থাকায় ইহা মিথ্যা।

(৩) এই গ্রামের মধ্যে আমার জমি বাদীদিগের অপেক্ষা অনেক বেশী, সুতরাং নদীর জল প্রবেশ করাইয়া কোন প্রকার ক্ষতিকর কার্য করিলে, আমার নিজের ক্ষতি সর্বাপেক্ষা অধিক হইত। সুতরাং এরূপ কার্য আমি কোন মতেই করিতে পারি না।

(৪) বাদীদিগের কতকগুলি স্বাক্ষরকারী এ গ্রামের লোক নহে। গ্রামের ক্ষতিবৃদ্ধিতে তাহাদের কোন লাভ লোকসান নাই। এবং কতকগুলি লোক একই বাড়ীরই লোক। সুতরাং দুই একজন লোক বিদ্বেষ বশতঃ অনেকগুলি স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া এই আবেদন করিয়াছে, আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত ও নিরর্থক কষ্ট দিবার জন্য।

(৫) এই বাঁধ পরিত্যক্ত হইবার পরে ৬০।৭০ বৎসর সরকার হইতে ইহার মেরামত হয় নাই। নদীর প্রবল স্রোত ও ঢেউয়ের জন্য অপরাপর স্থানে স্থানে যেমন ভাঙিয়া গিয়াছে, এই দুই স্থানে তেমনি ভাঙিয়াছে। আমার কোন প্রকার অপরাধের জন্য নহে।

(৬) এই দুই হানার নিকটেই অধুনা শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের বাটী। তিনি ও প্রধান শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দত্ত মহাশয় সমস্ত গ্রামের ভক্তি ও বিশ্বাসের পাত্র। ইহারা মধ্যস্থ হইয়া যেরূপ বিচার করিয়া দিবেন—ইত্যাদি।

প্রিয় বরদাবাবু,

তাড়াতাড়িতে আর লেখা হইল না। মুখুয্যে মশাই অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। বোধ হয় সালিশি মানাই ঠিক। ফকিরবাবু, আজকাল গ্রামেই বাস করিতেছেন। দাশ মশাইকে ছাড়িবেন না। মহারাজ বর্ধমান প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী।

আপনি ২।১টা point যা হয় add করে দিন। আপনার সংস্রব আছে জানলেও···

আপনার

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই গেল শরৎচন্দ্রের গ্রামে "একঘরে" বা অপাংক্তেয় থাকার কথা।

এইভাবে তিনি বহুদিন 'সজ্জন সমাজের' একাংশের নিকট অপাংক্তেয় হয়েই ছিলেন।

আর শরৎচন্দ্র যে বলেছেন, তাঁর সম্বন্ধে "কতই না জনশ্রুতি লোকের মুখে মুখে প্রচারিত।" একথাও ঠিক। শরৎচন্দ্র নিজেই এ সম্বন্ধে অন্যত্র আবার বলেছেন—

"আমার বিগত জীবনের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত উদাসীন।

জানি এ লইয়া বহুবিধ জল্পনা-কল্পনা ও নানাবিধ জনশ্রুতি সাধারণ্যে প্রচারিত আছে।"

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এই জনশ্রুতি আজ আর কিন্তু মুখে মুখে নেই। তাঁর মৃত্যুর পর অনেকে সেই জনশ্রুতিকে গ্রন্থ মধ্যে লিখে প্রচার করছেন। যেমন, একজন তাঁর "শরৎচন্দ্র" নামক একটি গ্রন্থে অনেক আজগুবি কাহিনী প্রকাশ করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রখ্যাত অধ্যাপক ও বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখক এই বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। এতে বইটার একটু কদরও বেড়েছে এবং বইটার কয়েকটা সংস্করণও শেষ হয়ে গেছে। অতএব বইটা একেবারে উপেক্ষার নয়। এখন এই "শরৎচন্দ্র" বই থেকে কয়েকটা আজগুবি কাহিনী শোনাচ্ছি—

গ্রন্থকার বলেছেন, শরৎচন্দ্র অল্প বয়সে যখন ভাগলপুরে তাঁর বাবার কাছে থাকতেন, তখনই তিনি একজন মদ্যপ হয়ে উঠেছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—"ঘরের একটা কোণে ভাঙা একটা বাক্সের মধ্যে স্তূপাকার করা মদের বোতল।...ঘুরছেন ফিরছেন আর একবার চুমুক দিচ্ছেন বোতলে।" শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে ছিলেন, তখনকার কথায় গ্রন্থকার আবার এক গল্প ফেঁদে শরৎচন্দ্রকে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মদ্যপ করে ছেড়েছেন। গ্রন্থকার লিখেছেন—এক গোয়ানিজ সাহেব চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, সারা এশিয়ায় এমন কেউ নেই যে, তাঁর সঙ্গে মদের নেশায় প্রতিযোগিতা করতে পারে। শরৎচন্দ্র এই কথা শুনে তাঁর সঙ্গে বাজী লড়তে গেয়েছিলেন। প্রতিযোগিতায় বসে দুজনে একটানা বোতলের পর বোতল মদ চালিয়ে যেতে লাগলেন। ভোরের দিকে সাহেব মদ খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত মারা গেলেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু অটল রইলেন।

গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থে পার্বতী নাম্নী একটি বিধবা যুবতীর সঙ্গে

শরৎচন্দ্রের প্রেমের এক দীর্ঘ চিত্র এঁকেছেন। এতে তিনি লিখেছেন—শরৎচন্দ্র শীতকালে রাতদুপুরে ঘোড়ায় চড়ে তাঁর প্রেমিকার সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছেন। যেতে যেতে ঘোড়া-শুদ্ধ নদীর জলে পড়ে গেলেন, তবুও ফিরলেন না। সেই শীতের রাতে ভিজে জামা কাপড়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতেই পার্বতীর কাছে গেলেন। পার্বতী যদিও শরৎচন্দ্রের ঐ আগমন বার্তার কিছুই জানতো না, তবুও সে বাড়ীর সকলকে লুকিয়ে ঠিক ঐ সময়টাতে জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিল। সামনে এসে পার্বতী চমকে উঠলো। বললে—একি? এত রাতে চান করে এলে যে?

শরৎচন্দ্র খুশিভরা হাসি হাসলেন। বললেন—সবই কপাল পারু। নইলে ঘোড়াটা পড়লো জলে ঝাঁপিয়ে?

পার্বতী চঞ্চল হয়ে উঠলো। লোকলজ্জার কথা ভুলে গেল। বললো—আর একটি মিনিটও এখানে নয়। চলো ওপরে।

বাড়ীর দাস-দাসী থেকে আরম্ভ করে সকলেই গভীর নিদ্রাসুখে মগ্ন। শুধু দুটি প্রাণী উঠে এলেন। পার্বতী নিজের হাতে পোষাক বদলে দিল। তারপর ধীর পদক্ষেপে উভয়েই নীচের খাবার ঘরে প্রবেশ করলেন।

মোমের বাতিটা জ্বালিয়ে আসন পেতে দিল পার্বতী। বললো—একটু বসো। খাবারগুলো গরম করে নিই।

শরৎচন্দ্র বাধা দিয়ে বললেন—আর মোটেই দেরি সইছে না। পেটের নাড়িভুঁড়িগুলো জ্বলে যাচ্ছে—কখন খেয়েছি সেই সকালে। দাও কিছুতো অন্ততঃ পেটে দিই। একটু থেমে বললেন, আমি যে আসবো, তোমায় কে জানিয়েছিল, পারু?

পার্বতী হাসলো। বললো, আমার মন!

শরৎচন্দ্র আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করতে সাহসী হলেন না। কারণ ভালবাসার রীতিই তো এই। নিঃশব্দে আহার শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন।

পার্বতী বাতিটি এগিয়ে দিয়ে বললো—সবই সাজিয়ে রেখে এসেছি। এবার শুয়ে পড়গে যাও। অনেক রাত হলো।

শরৎচন্দ্র তাঁর ১৭।১৮ বৎসর বয়সের সময় যখন তাঁর বাবা, ভাই ও বোন সকলের সঙ্গে একত্র থাকতেন, সেই সময় ঘুরছেন ফিরছেন মদের বোতলে চুমুক দিচ্ছেন এবং এত মদ খাচ্ছেন যে, ঘরের কোণে মদের বোতল স্তূপাকার হয়ে যাচ্ছে, একথা আদৌ বিশ্বাস করা যায় না। প্রথমতঃ শরৎচন্দ্রের পিতা সব সময়েই বাড়ীতে থাকতেন। তিনি কোন কাজ করতেন না। দ্বিতীয়তঃ ঐ সময় শরৎচন্দ্রের পিতা যেমন অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, শরৎচন্দ্রও তেমনি কিছুই উপার্জন করতেন না। অতএব অত মদের পয়সা আসবে কোথা থেকে?

পার্বতীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রেমের কাহিনীটিও এইরূপ একটি অবিশ্বাসের কাহিনী বলেই মনে হয়। এই কাহিনীটির মধ্যেকার অবাস্তবতা ও সঙ্গতি-হীনতা থেকেই তা বলা যেতে পারে। বেকার যুবক শরৎচন্দ্র গভীর রাত্রে ঘোড়ায় চেপে প্রেমিকার কাছে যাচ্ছেন, একথা কেউ বিশ্বাস করবেন না।

এই "শরৎচন্দ্র" গ্রন্থে আরও আছে যে, শরৎচন্দ্র প্রথম যৌবনে এক বার হেঁটে পুরী যাওয়ার সময়, পথে এক বাড়ীতে আশ্রয় নেন। সেই বাড়ীতে এক সুন্দরী বিধবা যুবতী এবং দুজন পুরুষ থাকত। পুরুষ দুজন ঐ যুবতীকে লাভ করবার জন্য পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। শরৎচন্দ্র এই বুঝতে পেরেই যুবতীটিকে বশ ক'রে তাকে নিয়ে লুকিয়ে উধাও হলেন। পরে সকালে যুবতীর প্রণয়ী-যুগল যুবতীটিকে

এবং শরৎচন্দ্রকে দেখতে না পেয়ে, তারা তখন এক হয়ে, তাঁদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। কিছু দূর গিয়েই তারা যুবতীটির সহিত শরৎচন্দ্রকে ধরে ফেলল। তখন তারা দুজনে মিলে শরৎচন্দ্রকে বেশ করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে যুবতীটিকে নিয়ে চলে এল। আর শরৎচন্দ্র মার খেয়ে গাছতলায় পড়ে তাদের দিকে "জুল্ জুল্ করে চেয়ে রইলেন।"

এছাড়া বইটিতে শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী সম্বন্ধেও খুব মজার মজার আজগুবী কাহিনী রয়েছে।

এই গ্রন্থের অনেক কাহিনীই সামান্য সূত্রের সহিত অলীক কল্পনা জুড়ে ফেনিয়ে বড় করা। আবার বহু কাহিনীই একেবারে গ্রন্থকারের মনগড়া। যেমন একটি উদাহরণ দিচ্ছি। গ্রন্থকার লিখেছেন—

"…সেবার ঠিক হ'ল শিবপুরে রবীন্দ্রনাথের একটা জয়ন্তী উৎসব করা হবে। উদ্যোগী হলেন অনুরূপবাবু, নীলরতনবাবু, আরও পাড়ার উৎসাহী যুবকবৃন্দ। তাদের পাণ্ডা হলেন শরৎচন্দ্র। তিনি নিজে চিঠি দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আনানর ব্যবস্থা করলেন।

লক্ষ্ণৌ থেকে আনা হ'ল বাইজী, তার সঙ্গে এলো পরিচিত আট দশ বছরের একটি বাঙালী মেয়ে।

ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ। কিন্তু বিঘ্ন ঘটালো তবল্‌চী। কথা ছিল আসার, কোন কারণবশতঃ তা আর সম্ভব হয়ে উঠলো না। কলকাতার নামজাদা বাজিয়েদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হ'ল।

নাচ সুরু হ'ল। রবীন্দ্রনাথ সামনে বসে আছেন তাকিয়াটি হেলান দিয়ে। মেয়েটি নাচতে নাচতে মাঝে মাঝে থেমে যেতে লাগলো—মুখে ফুটে উঠতে লাগলো বিরক্তির ছায়া।

সবাই বুঝলেন, তাল কেটে যাচ্ছে। অথচ সে আসরে তাঁর সামনে তবলা ধরতেও সাহসী হচ্ছে না কেউ।

দুবার মেয়েটি নাচতে নাচতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল! [illegible]

অসম্মান করা হচ্ছে ভেবে শরৎচন্দ্র আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলেন না। একটি হাই তুলে ডাক দিলেন, অনুরূপ!

অনুরূপবাবু ছুটে এলেন। শরৎচন্দ্র বললেন—একটু আফিং নিয়ে এসো। নীলরতন গেল কোথায়? তাকে মাঝে মাঝে বরং একটু চা যোগাতে বলো।

নাচ সুরু হ'ল। তাল আর কাটে না। সভা নিস্তব্ধ হয়ে পড়লো। শুধু শোনা যেতে লাগলো—তবলার বোল আর ঘুঙুরের ঝুম্ ঝুম্ শব্দ। এলো পেশাদার বাইজী। শরৎচন্দ্র অটল অচল। নাচ যখন থামল, তখন ভোর হয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হলেন তাঁর এই অসাধারণ শক্তির পরিচয় পেয়ে। জিজ্ঞাসা করলেন—এমন সুন্দর বাজাতে কোথায় শিখলে শরৎ?

শরৎচন্দ্র উত্তরে মৃদু হাসলেন। বললেন, আমার যা কিছু সঞ্চয় সবই বর্মামুলুকে, ভারতী!

অনুরূপবাবু ও নীলরতনবাবু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন—কার কাছে শিখেছিলেন?

শরৎচন্দ্র সহাস্যে উত্তর দিলেন—শিখেছিলাম লক্ষ্ণৌর এক তবল্চীর কাছে। তিনি বলতেন—এটা হ'ল হয় আমীর, না হয় ফকিরের কাজ। আমি তো সেখানে ফকিরই ছিলাম নীলু!

উপস্থিত সকলেই হেসে উঠলো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে হাসিতে যোগ দিতে পারলেন না।

বৈকালে রবীন্দ্রনাথ সকলকে এসরাজ বাজিয়ে শোনালেন। শেষে এসরাজটি পাশে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, বোধ করি এ রসে তুমি বঞ্চিত, শরৎ?

শরৎচন্দ্র মিষ্টি মধুর হাসি হেসে বললেন—এ অভাগার কোন কিছুতে বঞ্চনা নেই, ভারতী! একটু যদি অপেক্ষা করেন—আমি আপনাকে

সেতার শোনাতে পারি। অমুরূপ এক নম্বর এক্স একটু এনে দাও তো।

অমুরূপবাবু কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন। তিনি সেটুকু গলাধঃকরণ করে সেতারখানা কোলে তুলে নিলেন। ঘরটা মূর্চ্ছনায় ভরে উঠলো।

বহুক্ষণ পরে শরৎচন্দ্র সেতারখানা নামিয়ে রাখলেন। কিন্তু শ্রোতৃবর্গের কারও তখনও চমক ভাঙেনি।

ভারতীর তন্ময়তা কাটলো বহুক্ষণ পরে। তিনি শরৎচন্দ্রের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন—তুমি যে এত গুণের অধিকারী, তা আমার জানা ছিল না, শরৎ! সত্যই তুমি সরস্বতীর বরপুত্রই বটে!”

এই গল্পের খুঁটিনাটি কথাগুলো বাদ দিয়েও মূল কথা থাকে এই—রবীন্দ্রনাথ শিবপুরে তাঁর জন্মতিথি উৎসবে গিয়ে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে সারারাত্রি ধরে বাইজীর নাচ দেখলেন। পরদিন বিকালে আবার নিজে তো এসরাজ বাজালেনই, এমন কি শরৎচন্দ্রের সেতার বাজনাও শুনলেন। আর শরৎচন্দ্র সেতার ধরবার আগে রবীন্দ্রনাথের সামনে বসেই এক নম্বর এক্স অর্থাৎ মদ টানলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে যাঁরা সামান্ত মাত্রও চিনেছেন বা দেখেছেন, তাঁরাই জানেন—জন্মতিথি উৎসবে দুদিন ধরে যোগ দেওয়া এবং সারা রাত্রি ধরে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বাইজীর নাচ দেখার লোক রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। আর যে-শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলে শ্রদ্ধাভক্তি করতেন, তাঁর সামনে বসে তিনি কখনই মদ খেতে পারেন না। গ্রন্থকার জানেন না যে, মদ তো দূরের কথা, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে এত বেশী শ্রদ্ধা করতেন যে, তাঁর সামনে ধূমপানও করতেন না। এ সম্পর্কে তবে একটা ঘটনা বলি। এই ঘটনাটি শরৎচন্দ্র নিজেই তাঁর স্নেহভাজন শ্রীহীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে একদিন বলেছিলেন। হীরেন-

বাবু এই কাহিনীটি অধুনালুপ্ত "মাসিকপত্র" কাগজের ১৩৫৬ সালের মাঘ সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করেছেন। কাহিনীটি এই—

রবীন্দ্রনাথ এক সময় যখন চন্দননগরে গঙ্গার উপর বোটে বাস করতেন, সেই সময় শরৎচন্দ্র একবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যান। কবির সঙ্গে সেবার শরৎচন্দ্রের অনেক বছর পরে দেখা। বহুদিন পরে দেখা বলে, কবি শরৎচন্দ্রকে তখনি ছাড়তে চাইলেন না। শরৎচন্দ্র ঘণ্টা দুই কবির কাছে ছিলেন। কবি তো শরৎচন্দ্রের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের বিপদ হ'ল এই যে, তিনি ঘন ঘন ধূমপায়ী হয়েও কবির সামনে আদৌ ধূমপান করতে পারলেন না। শরৎচন্দ্র যে অত্যন্ত ধূমপায়ী, কবি একথা জানতেন। তাই শরৎচন্দ্র ধূমপায়ী হয়েও তাঁর সামনে ধূমপান করছেন না দেখে, কবি ঠিক আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর চা, খাবার, এটা ওটার নাম করে শরৎচন্দ্রকে সামনে থেকে সরিয়ে তাঁর সেক্রেটারী অনিল চন্দের কাছে চালান করে দিতে লাগলেন। আর ঐ অবকাশে শরৎচন্দ্র বাইরে গিয়ে ধূমপান করে আসতে লাগলেন।

ঘন ঘন ধূমপায়ী হয়েও শরৎচন্দ্র যে রবীন্দ্রনাথের সামনে আদৌ ধূমপান করতেন না, একথা আরও অনেকে—যাঁরা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উভয়কে অনেকক্ষণ ধরে একত্র থাকতে দেখেছেন, তাঁরাও বলে থাকেন। যে শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের কাছে একটা সিগারেট পর্যন্ত খেতেন না, তিনিই তাঁর সমানে বসে মদ খাচ্ছেন, একি কখনো সম্ভব ?

তাছাড়া গ্রন্থকারের গল্পের অনুরূপবাবু ও নীলরতনবাবু এঁরা দুজনেই আজও, এই প্রবন্ধ লেখবার সময়, বেঁচে আছেন। তাঁরা বলেন যে, এই কাহিনী সত্য নয়। শিবপুরে কখনো ঐ ধরণের কোন রবীন্দ্র-জন্মোৎসব হয়নি।

শিবপুরে শরৎচন্দ্রের আর যে সব বন্ধু জীবিত আছেন, তাঁরাও

বলেন—শিবপুরে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে রবীন্দ্রনাথ নিজে কখনো আসেন নি। এমন কি তাঁর কোন জন্মোৎসবে তাঁকে নিয়ে আসারও কখনো চেষ্টা হয়নি।

অতএব পূর্বোক্ত "শরৎচন্দ্র" গ্রন্থের অন্তর্গত এই গল্পটি যে একেবারেই অসত্য, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

এই তো গেল, শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে জনশ্রুতি, প্রবাদ বা অপপ্রচারের কাহিনী। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে এই যে, এই সব জনশ্রুতি বা প্রবাদের মধ্যে কোথাও কি সত্যের এতটুকু বাষ্পও ছিল না।

ছিল না, এ কথা জোর করে বলা যায় না। কেন না, শরৎচন্দ্র চিঠিপত্রে এবং মুখে, সত্য-মিথ্যায় করে তাঁর ব্যক্তিজীবনের এমন সব কাহিনী বন্ধুবান্ধবদের কাছে বলে গেছেন, যাতে করে তিনি নিজেই তাঁর সম্বন্ধে অপপ্রচারের অনেকটা অবকাশ দিয়ে গেছেন। যেমন এখানে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। এই একটি উদাহরণই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি :—

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে তাঁর বাল্যবন্ধু বিভূতিভূষণ ভট্টকে এক পত্রে লেখেন—

"...বুঝিতে পারি যে, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেরই আমি ঘৃণার পাত্র।...জানি বিশ্বাসের কোন রাস্তা আমি রাখি নাই। চিরপ্রবাসী, দুঃখী, কুৎসিৎ-আচারী আমি কাহারো সম্মুখে বাহির হইতে পারিব না।...সাধু সাজিতেছি না ভাই—এত পঙ্কিল জীবনে সাধুত্বের ভাণ খাটিবে না"—

এরপর ঐ চিঠিতেই শরৎচন্দ্র এক রজক কন্যার সহিত আঠার মাস ব্যাপী তাঁর দাম্পত্য প্রেম-চর্চার এক চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সেই কাহিনীটি এই গ্রন্থ মধ্যে "রজকিনী" অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

এই চিঠির মধ্যেই শরৎচন্দ্র তাঁর নিজের সম্বন্ধে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা ও অপপ্রচারের সুযোগ দিয়ে গেছেন।

শরৎচন্দ্রের বিবাহিত জীবনটা একটা বড় ধোঁয়াটে ব্যাপার। তাই এ সম্বন্ধে নানা জনে নানান্ ধরণের মজার মজার গল্প বলেন। কেউ কেউ এ সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখেওছেন। এঁদের এই সব লেখা নিয়ে এবং শরৎচন্দ্র বিয়ে করে ছিলেন কিনা, বিয়ে করলে ক'টা বিয়ে করেছিলেন, তাঁর "জীবন-সঙ্গিনী" হিরণ্ময়ী দেবী কোথাকার মেয়ে এবং কোথায় তাঁকে পান, আর ঐ রাজলক্ষ্মীই বা কে, এই সব সম্বন্ধে এক সময় আমি পাঁচ মাস ধরে "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রিকায় "শরৎচন্দ্রের বিবাহ-প্রসঙ্গ" নাম দিয়ে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলাম।

বিভূতিভূষণ ভট্টকে লেখা শরৎচন্দ্রের পূর্বোক্ত চিঠিটি 'পরিক্রমা' নামক একটি পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হলে, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় সেই সময় শারদীয় সংখ্যা "শনিবারের চিঠিতে" প্রথমেই সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখেছিলেন—এবারের সম্পাদকীয় আর দুর্গাস্তুতি বা শরৎকালের বর্ণনা নয়, এবারের শারদীয় সম্পাদকীয় হচ্ছে, শরৎ চাটুজ্যে সম্পর্কিত। হিট্‌লার ও সুভাষ বসুর বিবাহ নিয়ে আমরা অনেক গল্প শুনতে পাই। শরৎচন্দ্রের বিবাহ নিয়েও তাই। শেষ শরৎ-গবেষক অত্যুৎসাহী শ্রীগোপালচন্দ্র রায় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় কয়েকমাস ধরে শরৎচন্দ্রের বিবাহ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্ত করে দেন। গোপালচন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের পর আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু পুঁটু অর্থাৎ বিভূতিভূষণ ভট্ট তাঁর পুরাতন ঝাঁপি হতে কালভুজঙ্গের ন্যায় হঠাৎ একখানি পত্র বা'র করে একি কাণ্ড বাধালেন! এর এখন উত্তর দিতে পারেন, একমাত্র গোপালচন্দ্র রায়। আমরা তাঁরই শরণাপন্ন হচ্ছি।

শনিবারের চিঠিতে সজনীবাবুর এই লেখা পড়ে শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুণা থেকে এক পত্রে, ঐ সম্বন্ধে আমি কোন কিছু লিখব কিনা, আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন।

এরপরেও সজনীবাবু একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন— শরৎচন্দ্রের বিবাহ ও প্রণয়-কাহিনী নিয়ে যে সব প্রচার ও অপপ্রচার রয়েছে, সে সবের একটা সুষ্ঠু আলোচনা হওয়া দরকার। তুমি ঐ সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার আলোচনা করে দাও।

শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এবং শরৎচন্দ্রের আর এক বন্ধু কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় এঁরাও আমাকে ঐ কথাই বলেন।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যে সব জনশ্রুতি, প্রবাদ ও অপপ্রচার আছে, সেগুলির যে এখনি একটা সুষ্ঠু আলোচনা দরকার, এ কথা বোধ করি সকলেই স্বীকার করবেন। কেননা, তা না হ'লে, বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপকের ভূমিকা সমন্বিত, কয়েক সংস্করণ নিঃশেষিত পূর্বোক্ত "শরৎচন্দ্র" গ্রন্থটির ন্যায়, আরও অনেক গ্রন্থেই শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে, বিশেষ করে তাঁর বিবাহ ও প্রণয়-ঘটিত কাহিনীগুলি নিয়ে নানা বিকৃত ও মনগড়া আজগুবি গল্প ক্রমশঃ প্রচারিত হতে থাকবে। তখন সে সব রোধ করা কষ্টকর হয়ে পড়বে। এই কারণেই আমি "শরৎচন্দ্রের প্রণয়-কাহিনী" নাম দিয়ে এই গ্রন্থটি রচনা করেছি।

শরৎচন্দ্রকে সাধু সাজানো, বা হেয় করা এই গ্রন্থের আদৌ উদ্দেশ্য নয়। তিনি যা, তাই, নানা নজীর ও প্রমাণ সহযোগে আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি মাত্র।

শরৎচন্দ্রের প্রণয়-কাহিনী

হৃদয়-দৌর্বল্য

শরৎচন্দ্র একবার এক পত্রে কবি রাধারাণী দেবীকে লিখেছিলেন :—

"আমার মত কুঁড়ে মানুষ সংসারে আর দ্বিতীয় নেই। একান্ত বাধ্য না হ'লে কখনো কোন কাজই আমি করতে পারিনে। তবুও এতগুলো বই লিখেছিলাম কি করে? সেই ইতিহাসটাই বলি।

আমার একজন 'গারজেন' ছিলেন। এঁর পরিচয় জানতে চেও না। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, তাঁর মত কড়া তাগাদাদার পৃথিবীতে বিরল। এবং তিনিই ছিলেন আমার লেখার সব চেয়ে কঠোর সমালোচক। তাঁর তীক্ষ্ণ তিরস্কারে না ছিল আমার আলস্যের অবকাশ, না ছিল লেখার মধ্যে গোঁজামিলের সাহায্যে ফাঁকি দেবার সুযোগ। এলো-মেলো একটা ছত্রও তাঁর কখনো দৃষ্টি এড়াতো না। কিন্তু এখন তিনি সব ছেড়ে ধর্ম-কর্ম নিয়েই ব্যস্ত। গীতা-উপনিষদ ছাড়া কিছুই আর তাঁর চোখে পড়ে না। কখনো খোঁজও করেন না, এবং আমিও বকুনি ও তাড়া খাওয়া থেকে এ জন্মের মতো নিস্তার পেয়ে বেঁচে গেছি। মাঝে মাঝে বাইরের ধাক্কায় প্রকৃতিগত জড়তা যদি ক্ষণকালের জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখনি আবার মনে হয়—ঢের ত লিখেছি, আর কেন, এ জীবনের ছুটিটা যদি এই দিক থেকে এমনি করেই দেখা দিলে, তখন মিয়াদের বাকি দু চারটে বছর ভোগ করেই নিই না কেন? কি বল রাধু? এই কি ঠিক নয়? অথচ লেখবার কত বড় বৃহৎ অংশই না অলিখিত রয়ে গেল। পরলোকে বাণীর দেবতা যদি এই ত্রুটির জন্য কৈফিয়ৎ তলব করেন তো, তখন আর একজনকে দেখিয়ে দিতে পারবো, এই আমার সান্ত্বনা।"

শরৎচন্দ্র, রাধারাণী দেবীকে আর একটি পত্রে লিখেছিলেন :—

"রাধু, তোমার আগেকার চিঠি যথাসময়েই পেয়েছিলাম এবং নূতন বছরের আরম্ভে যে আশীর্বাদ চেয়েছিলে, তা মনে মনে দিতে কোন কৃপণতা করিনি, শুধু প্রকাশ্যে জানানোটা ঘটে ওঠেনি ভাই। 'এই কালই জবাব দেবো' এই একটি প্রতিজ্ঞা প্রত্যহ সকালে উঠেই করেছি এবং করতে করতে মাস দেড়েক কেটে গেলো। এমনি স্বভাব! অথচ তোমাদের আজও এ জ্ঞান জন্মালো না যে, ভাবো—'দাদাটি তোমাদের স্বর্গে গেছেন—আর তাকে স্মরণ করাই বা কেন, আর তার আশীর্বাদ চাওয়াই বা কিসের জন্য।' আর কদিনই বা বাকি আছে বোন! একটু আগে থেকেই না হয় ভাবলে। কি এমন ক্ষতি? আরও তো কেউ কেউ এইটাই স্বীকার করে নিয়ে একেবারে নিরুদ্দেশের আড়ালে মিলিয়ে গেছেন। তোমরা পারো না?"

শরৎচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে যে সব চিঠিপত্র লিখেছিলেন, তার যত দূর সম্ভব সংগ্রহ করতে পেরেছি, সেই সব নিয়ে "শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র" নাম দিয়ে আমি একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছি। এই গ্রন্থে রাধারাণী দেবীকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠিগুলিও আছে।

এখানে উদ্ধৃত রাধারাণী দেবীকে লেখা শরৎচন্দ্রের পত্রাংশ দুটির মধ্যে প্রথমটিতে "আমার একজন 'গারজেন' ছিলেন, এঁর পরিচয় জানতে চেও না" যে লেখা আছে, রাধারাণী দেবী কিন্তু শেষ পর্যন্ত এঁর পরিচয় জানতে পেরে ছিলেন।

"শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র" গ্রন্থটি সম্পাদনা কালে শরৎচন্দ্রের উক্ত "গারজেন"এর কথা রাধারাণী দেবীকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি আমার কাছে মুখে একজন মহিলা সাহিত্যিকের নাম করলেও, গ্রন্থে গারজেনের পাদটীকায় নাম বাদ দিয়ে শুধু "জৈনক মহিলা সাহিত্যিক" এই কথাটি লিখতে বলেছিলেন।

রাধারাণী দেবী ব্যতীত শরৎচন্দ্রের কয়েকজন বন্ধুর কাছ থেকেও পরে উক্ত মহিলা সাহিত্যিক মহোদয়ার নাম আমি জানতে পারি। নানা কারণে এখানে উক্ত ভদ্র মহিলার নামটি গোপন করেই গেলাম।

উপরে উদ্ধৃত রাধারাণী দেবীকে লেখা দ্বিতীয় পত্রাংশটিতে যে "আরও তো কেউ কেউ এইটাই স্বীকার করে নিয়ে একেবারে নিরুদ্দেশের আড়ালে মিলিয়ে গেছেন" আছে, এ সম্বন্ধে রাধারাণী দেবীকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি মুখে পূর্বোক্ত মহিলা সাহিত্যিকের নাম বলে ঐ কথাগুলির পাদটীকায় যা লিখতে বলেছিলেন, তা হচ্ছে এইঃ—"শরৎচন্দ্রের জীবনে একটা গোপন বেদনা ছিল, তাঁর এই বেদনার কথা রাধারাণী দেবী জানতেন। তাই রাধারাণী দেবীকে লেখা বহু পত্রেই তাঁর এই বেদনার আভাষ পাওয়া যায়। এখানেও সেই আভাষই ব্যক্ত হয়েছে।"

আমার সম্পাদিত "শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র" গ্রন্থটিতে রাধারাণী দেবীকে লেখা শরৎচন্দ্রের উপরোক্ত পত্র দুটির পাদটীকায় রাধারাণী দেবী যা লিখতে বলেছিলেন, তাই মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

রাধারাণী দেবীকে লেখা বহু পত্রেই যেমন শরৎচন্দ্রের "গোপন বেদনার আভাষ" আছে, লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায় নাম্নী একজন মহিলা লেখিকাকে লেখা শরৎচন্দ্রের একটি পত্রেও তেমনি তাঁর সেই গোপন বেদনার কথাই পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে। শরৎচন্দ্রের সেই পত্রটি এই :—

"পরম কল্যাণীয়াসু,

…আমার মানসিক পরিবর্তন সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন তুমি বহুদিন হইতে করিয়া আসিতেছ, এবং বহুদিন হইতেই আমি নীরবে আছি। কিন্তু আমার মত যখন তোমার বয়স হইবে, তখন হয়ত ইহা

বুঝিতেও পারিবে যে, জগতে মানুষের এমন কথাও থাকিতে পারে, যাহা কাহারও কাছে ব্যক্ত করা যায় না। গেলেও তাহাতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের মাত্রাই বাড়ে। অথচ, এই নীরবতার শাস্তি অতিশয় কঠিন।

ভীষ্ম যে একদিন স্তব্ধ হইয়া শরবর্ষণ সহ্য করিয়াছিলেন, সে কথাটা চিরদিনের জন্য মহাভারতে লেখা হইয়া গেল, কিন্তু কত অলিখিত মহাভারতে যে এমন কত শরশয্যা নিত্যকাল ধরিয়া নিঃশব্দে রচিত হইয়া আসিতেছে, তাহার একটা ছত্রএ কোথাও বিদ্যমান নেই। এমনি করিয়াই সংসার চলিতেছে।...

তোমার এই দাদাটির অনেক বয়স হইয়াছে, অনেকের অনেক প্রকারের ঋণ এ নাগাদ শোধ করিতে হইয়াছে। তাহার এই উপদেশটি কখনো বিস্মৃত হইও না যে, পৃথিবীতে কৌতূহল বস্তুটির মূল্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়া যত বড়ই হোক্, তাহাকে দমন করার পুণ্যও সংসারে অল্প নয়।

যে বেদনার প্রতিকার নাই, নালিশ করিতে গেলে যাহার নীচেকার পঙ্ক জেরায় জেরায় একেবারে উপর পর্যন্ত ঘুলাইয়া উঠিতে পারে, সে যদি থিতাইয়া থাকে তো থাক না। কি সেখানে আছে. নাই বা জানা গেল, কি এমন ক্ষতি ?"

শরৎচন্দ্র নাকি জীবন ভোরই তাঁর এই বেদনা বয়ে বেড়িয়েছেন। তিনি তাঁর প্রথম যৌবন থেকে শেষ বয়স পর্যন্ত ঐ ভদ্রমহিলার কথা ভুলতে পারেন নি। এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় আমাকে ক'টি গল্প বলেছিলেন। একটি গল্প এই :—

শরৎচন্দ্র কথিত তাঁর "গারজেন" ভদ্রমহিলা বিখ্যাত লেখিকা অনুরূপা দেবীর বান্ধবী ছিলেন। অনুরূপা দেবী তাঁর মাসতুতো ভাই

উপরোক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকট এই গল্পটি বলেছিলেন। সৌরীনবাবু বলেন :—দিদির বান্ধবীটি ছেলেবেলা থেকেই একটু আধটু ধর্ম-কর্ম করতেন। কিন্তু প্রথম যৌবনেই অকস্মাৎ বিধবা হয়ে যাওয়ায়, তাঁর এই ধর্ম-কর্মের মাত্রাটা আরও অনেকগুণ বেড়ে যায়। তখন তিনি ভাগলপুরে তাঁর পিতার কাছে শরৎচন্দ্রদের পল্লীতেই থাকতেন। এক দিন তিনি ঘরের দাওয়ায় বসে বঁটিতে পূজার ফল কাটছেন। বাড়ীর সকলে কোথায় যেন গেছেন। কেবল তিনিই একা বাড়ীতে আছেন। এমন সময় হঠাৎ শরৎচন্দ্র কোথা থেকে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। এসেই বললেন—এই যে, কেমন আছ ?

বাড়ীতে কেউ নেই, এই অবস্থায় শরৎচন্দ্রকে সামনে দেখে দিদির বান্ধবী অত্যন্ত সঙ্কুচিতা হয়ে পড়লেন এবং তখনই তিনি শরৎচন্দ্রকে বাড়ী থেকে চলে যেতে বললেন। আর একটু রূঢ়ভাবেই বললেন।

শরৎচন্দ্র অগত্যা আস্তে আস্তে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শরৎচন্দ্র দিদির বান্ধবীর দাদাদের বন্ধু ছিলেন। শরৎচন্দ্রের ঐভাবে একাকী বাড়ীর মধ্যে যাওয়ায় এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করাকে তিনি আদৌ ক্ষমা করতে পারলেন না। দাদারা বাড়ী ফিরে এলে, তিনি দাদাদের কাছে নালিশ করে বললেন—তোমাদের বন্ধুটি কি রকম লোক বলত ? বাড়ীতে কেউ নেই, তবু বাড়ীর ভিতরে ঢুকে আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন।

জপতপপরায়ণা, কঠোর ব্রহ্মচারিণী, বালবিধবা ঐ ভদ্রমহিলা সেদিন শরৎচন্দ্রকে এমনি ভাবেই সরিয়ে দিয়ে ছিলেন।

এই ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের একতরফা এই হৃদয়-দৌর্বল্যের কথা এবং এঁকে নিয়ে বিভিন্ন জনের কাছে শরৎচন্দ্রের এইরূপ চিঠি লেখা ও তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলার কথা, অনুরূপা দেবী জানতেন। অনুরূপা দেবী তাই একবার এক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন :—

"তিনি (অর্থাৎ শরৎচন্দ্র) সুবিধা মত অনেকের কাছে নিজের মর্যাদা বাড়াবার জন্যই হোক্, কিম্বা শুধু কল্পনা বিলাসের আকাশ-কুসুম চয়নের জন্যই হোক্, বা আনন্দলাভের জন্যই হোক্, অনেক রকম অবান্তর ও অনধিকার রটনা করে বেড়িয়েছেন। যা নিয়ে অন্য কোন সমাজ হ'লে ডিফারমেসন চার্জ দিয়ে মামলা আনাও চলতে পারতো। আমাদের উচ্চ হিন্দু সমাজে ধৃষ্টব্যক্তিকে যথাসাধ্য পরিহার করেই চলতে উপদেশ দেওয়া হয়। কাদামাটি ঘেঁটে পাঁক তৈরী করতে ব'লে নয়। যে ভদ্রসমাজের নামজাদা ঘরের সম্মানিতা মহিলাদের সম্বন্ধে কতখানি সংযতভাবে কথা বলা উচিত, আজকের দিনের বহুসম্মানিত, সেদিনকার ছন্নছাড়া, ভবঘুরে লোকটির যে উচ্চ শিক্ষা ছিল না। সে আমি, আমার স্বামী এবং এখনও বর্তমান দু'একজন নরনারী প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি। তিনি তাঁর বন্ধুর ছোট বোনকে··· * বলে উল্লেখ করতে পারেন, সেটা কিছু বিচিত্র নয়, কিন্তু তাই থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, অর্ধশতাব্দী পূর্বে নিতান্ত নিয়মতান্ত্রিক ঘরের বালবিধবার শরৎচন্দ্রের মত চরিত্রের একজন অনাত্মীয় তরুণের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মেলামেশা চলতো।"

অনুরূপা দেবী যে বলেছেন—শরৎচন্দ্র শুধু কল্পনা বিলাসের আকাশ-কুসুম চয়নের জন্যই হোক্, বা আনন্দলাভের জন্যই হোক্ পূর্বোক্ত মহিলা সাহিত্যিক মহোদয়াকে নিয়ে অনেক রকম অবান্তর ও অনধিকার রটনা করে বেড়িয়েছেন, একথা অনেকাংশেই সত্য বলে আমাদেরও মনে হয়। কেননা শরৎচন্দ্র রাধারাণী দেবীকে—"এতগুলো বই লিখেছিলাম কি করে? সেই ইতিহাসটাই বলি। আমার একজন 'গারজেন' ছিলেন,···তাঁর মত কড়া তাগাদাদার পৃথিবীতে বিরল।"

---

* অনুরূপা দেবী এইখানে তাঁর বান্ধবীর ডাক নামটি উল্লেখ করে গেছেন। আমি সে নামটি আর প্রকাশ না করে অনুদ্ধৃতই রেখে গেলাম।

ইত্যাদি লিখলেও অন্যত্র তিনি তাঁর "আত্মকথা" প্রবন্ধে লিখেছিলেন :—

"আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য ঘটে নি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকার সূত্রে আর কিছুই পাই নি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল—আমি অল্প বয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলুম। আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভ'রে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনটাই তিনি শেষ করতে পারেন নি। তাঁর লেখাগুলি আমার কাছে নেই—কবে কেমন করে হারিয়ে গেছে, সে কথা আজ মনে পড়ে না। কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় কতবার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। কেন তিনি এগুলি শেষ করে যান নি, এই ব'লে কত দুঃখই না করেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কি হ'তে পারে, ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধ হয়, সতের বৎসর বয়সের সময় আমি গল্প লিখতে সুরু করি। কিন্তু কিছু দিন বাদে গল্প রচনা অ-কাজের কাজ মনে ক'রে, আমি অভ্যাস ছেড়ে দিলাম। তারপর অনেক বৎসর চলে গেল। আমি যে কোনকালে একটি লাইনও লিখেছি, সে কথা ভুলে গেলাম।

আঠার বৎসর পরে একদিন লিখতে আরম্ভ করলাম। কারণটা দৈব দুর্ঘটনারই মত। আমার গুটিকয়েক পুরাতন বন্ধু একটি ছোট মাসিক পত্র বের করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের কেউই এই সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজী হলেন না। নিরুপায়

হয়ে তাঁদের কেউ কেউ আমাকে স্মরণ করলেন। বিস্তর চেষ্টায় তাঁরা আমার কাছ থেকে লেখা পাঠাবার কথা আদায় করে নিলেন। এটা ১৯১৩ সনের কথা। আমি নিমরাজী হয়েছিলাম। কোন রকমে তাঁদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যেই আমি লেখা দিতেও স্বীকার হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য, কোন রকমে রেঙ্গুনে পৌছতে পারলেই হয়। কিন্তু চিঠির পর চিঠি, আর টেলিগ্রামের তাড়া আমাকে অবশেষে সত্য সত্যই আবার কলম ধরতে প্রয়োচিত করল। আমি তাঁদের নব প্রকাশিত "যমুনা"র জন্য একটি ছোট গল্প পাঠালাম। এই গল্পটি প্রকাশ হতে না হতেই বাঙ্গলার পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করল। আমিও একদিনেই নাম করে বসলাম। তারপর আমি অদ্যাবধি নিয়মিতভাবে লিখে আসছি। বাঙ্গলা দেশে বোধ হয়, আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান লেখক, যাকে কোনদিন বাধার দুর্ভোগ ভোগ করতে হয় নি।" (বাতায়ন, শরৎ-স্মৃতি সংখ্যা, ১৩৪৪)

এখানে উদ্ধৃত শরৎচন্দ্রের এই "আত্মকথা" প্রবন্ধ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শরৎচন্দ্রের বই লেখার সঙ্গে তাঁর "গারজেনে"র কোনরূপই সম্পর্ক নেই।

তবে শরৎচন্দ্র তাঁর "গারজেন" সম্বন্ধে যে বলেছেন—তিনি অত্যন্ত ধর্ম-কর্ম পরায়ণা ছিলেন, সেকথা খুবই সত্য। ঐ ভদ্র মহিলা জীবন ভোরই বার-ব্রত ও ধর্ম-কর্ম নিয়েই ছিলেন। এ কথা রাধারাণী দেবী, অনুরূপা দেবী ছাড়াও শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও বলে থাকেন।

উক্ত ভদ্রমহিলার আচারনিষ্ঠা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের বন্ধু এবং অনুরূপা দেবীর মাসতুতো ভাই পূর্বোক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বলেন—

অনুরূপা দিদির বান্ধবী বলে আমি তাঁকে দিদি বলতাম। সেই দিদি একবার আমাদের কলকাতার বাড়ীতে এসেছিলেন। আমরা যদিও ব্রাহ্মণের আচার-নিষ্ঠা এবং বাচ-বিচার যথাসম্ভব মেনে চলি, তবুও

তিনি আমাদের বাড়ীতে এসে, ধোয়া রান্নাঘর আবার নিজের হাতে গোবর দিয়ে নিকিয়ে নিলেন। বাসন-কোসনও আবার নিজের হাতে ধুয়ে, তাতে রান্না করে, তবে খেলেন।

কঠোর ব্রহ্মচর্যপরায়ণা, ধর্মশীলা, বালবিধবা এই ভদ্রমহিলার প্রতি শরৎচন্দ্রের একতরফা এই হৃদয় দৌর্বল্যের কথা, তিনি হয়ত তেমন জানতেনই না।

যাই হোক্, তবুও এই ভদ্রমহিলার জন্য শরৎচন্দ্রের একটি মস্ত বড় ত্যাগের কাহিনী আমি যা জানি, সেটিও মোটেই উপেক্ষার নয়। এখানে এখন সেই কাহিনীটিই বলছি ঃ—

শরৎচন্দ্র উক্ত মহিলা সাহিত্যিক মহোদয়ার দাদাদের বন্ধু ছিলেন। ঐ ভদ্র মহিলা ছেলেবেলায় তাঁর দাদাদের মারফৎ শরৎচন্দ্রের "শুভদা" উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি একবার পড়েছিলেন। ফলে শুভদার প্রভাব তাঁর প্রথম বয়সের লেখা একটি উপন্যাসে বিশেষভাবে পড়ে। পরে ঐ উপন্যাসটি প্রকাশিত হলে, শরৎচন্দ্র সেটি পড়ে দেখেন যে, তাতে তাঁর শুভদা উপন্যাসের কাহিনীর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

শুভদা প্রকাশিত হ'লে, পাছে ঐ মহিলা লেখিকা হেয় হয়ে পড়েন, এই ভেবে শরৎচন্দ্র তাঁর শুভদা উপন্যাসটি আর ছাপালেনই না। তবে পাণ্ডুলিপিটি নষ্ট না করে রেখে দিলেন এই আশায় যে, অবসর পেলে পরে গল্পটিকে বদলে আবার নতুন করে লিখবেন। শুভদার পাণ্ডুলিপি দীর্ঘকাল পড়ে রইল। শরৎচন্দ্রের অবসর আর হয়ে উঠল না। তখন শরৎচন্দ্র শেষ বয়সে একদিন ওটিকে আর না রেখে পুড়িয়ে ফেলাই ঠিক বলে মনস্থ করলেন।

শরৎচন্দ্র ঐ সময় তাঁর হাওড়া জেলার সামতাবেড়ের বাড়ীতে থাকতেন। একদিন তিনি তাঁর সম্পর্কীয় ভাগ্নে (তাঁর দিদি অনিলা দেবীর মেজ জায়ের ছেলে, ইনি শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে থেকে লেখাপড়া

শিখতেন) রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে বহু পুরাতন কাগজ-পত্রের সহিত শুভদার পাণ্ডুলিপিটিও পোড়াতে দিলেন।

শুভদা বইটি একটি সুন্দর বাঁধানো মোটা খাতায় লেখা ছিল। ঐরূপ একটি সুন্দর খাতায় লেখা পাণ্ডুলিপি দেখে রামকৃষ্ণবাবু শরৎচন্দ্রকে বললেন—এটা কেন পোড়াতে দিচ্ছেন ?

উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন—ওটাকে পুড়িয়ে ফেলতেই হবে। আমার ও বই বেরুলে, একজন অত্যন্ত হেয় হয়ে পড়বেন।

রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কিন্তু শুভদার পাণ্ডুলিপিটি না পুড়িয়ে কাগজ পোড়াবার সময় এক ফাঁকে সেটিকে সরিয়ে রাখলেন এবং পরে সেটি এনে শরৎচন্দ্রেরই একটি আলমারীর বইয়ের পিছনে লুকিয়ে রাখলেন।

শরৎচন্দ্র এর কিছুই জানতে পারলেন না। তিনি বরং রামকৃষ্ণবাবু কাগজ পুড়িয়ে ফিরলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি রে, সেই মোটা খাতাটা পুড়িয়েছিস্ তো ?

উত্তরে রামকৃষ্ণবাবু বলেছিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শরৎচন্দ্রের কাছে যে তাঁর বাল্য-রচনা "শুভদা" নামে একটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি আছে, একথা তাঁর বন্ধুদের কেউ কেউ জানতেন। শরৎচন্দ্রের বন্ধুরা শুভদার পাণ্ডুলিপিটি পড়বার জন্য শরৎচন্দ্রকে খুবই পীড়াপীড়ি করতেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু কাউকেই পাণ্ডুলিপিটি দেখান নি। শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন বন্ধু বাতায়ন-সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই সময় শুভদার পাণ্ডুলিপিটি পড়বার জন্য একবার খুব জেদ করেন। শরৎচন্দ্র তখন তাঁকে খানিকটা পোড়া ছাই দেখিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে অবিনাশবাবু লিখেছেন ঃ—

"শুভদা সম্পর্কে আমার সঙ্গে তাঁর যে নাটকীয় ঘটনা ঘটেছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ না দিয়ে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, 'শুভদা'র পাণ্ডুলিপি শোনাবার জন্য আমার পাড়াপীড়িতে তিনি শেষ পর্যন্ত

আমাকে পড়তে দিতে রাজী হয়ে আমাকে সামতাবেড়ে যাবার জন্যে একটি দিন নির্দেশ করে দেন। নির্দিষ্ট দিনে আমি যখন উপস্থিত হলুম, তখন তিনি অতি বিমর্ষ ভাবে বললেন—অবিনাশ, সব শেষ হয়ে গেছে! তিনি এমনি ভাবে কথাগুলি বললেন, যেন আমি তাঁর কোন রুগ্ন পুত্রকে দেখতে গেছি, যার মৃত্যু সংবাদটি তিনি আমাকে শোনালেন। এই বলেই তিনি পাশের ঘর থেকে একটি বিস্কুটের টিনে খানিকটা কাগজ পোড়া এনে আমাকে বললেন—পাছে তুমি অবিশ্বাস কর, তাই শুভদার পাণ্ডুলিপির পোড়া ছাই তোমার জন্যে রেখে দিয়েছি। এরপর আমার আর কি বলবার থাকতে পারে! কিন্তু এই ব্যাপারটি যে মিথ্যা, তা এখন বেশ বোঝা গেছে। কিন্তু প্রশ্ন এই, কেন শুভদা তিনি তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশ করেন নি, আর কেনই বা এ পাণ্ডুলিপি তিনি কাউকে পড়তে দিতে চান নি। তাঁর নিজের মুখেই শুনেছি, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের (গুরুদাস কোং) শত অনুরোধেও তিনি এ পাণ্ডুলিপি তাঁকে দেখান নি। কেন? কিসের জন্য শুভদা সম্পর্কে তাঁর এ মনোভাব ছিল? শরৎচন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবনীকারদের নিকট থেকে এ প্রশ্নের উত্তরের আশায় রইলুম।”

শরৎচন্দ্র শুভদা ছাপানো তো দূরের কথা পাণ্ডুলিপিটি পর্যন্ত কেন যে কাউকেও পড়তে দিতেন না, আশা করি অবিনাশবাবু এখানে এখন তার উত্তর পেলেন।

শরৎচন্দ্র ঐ সময়েই “ছোটদের মাধুকরী” নামক একটি পত্রিকায় “বাল্যস্মৃতি” নাম দিয়ে এক প্রবন্ধে লেখেন :—

“ছেলেবেলার লেখা কয়েকটা বই আমার নানা কারণে হারাইয়া গেছে। সবগুলার নাম আমার মনে নাই। একখানা ‘অভিমান’ মস্ত মোটা খাতায় স্পষ্ট করিয়া লেখা, অনেক বন্ধু বান্ধবের হাতে হাতে ফিরিয়া অবশেষে গিয়া পড়িল বাল্যকালের সহপাঠী কেদার সিংহের

হাতে। কেদার অনেক দিন ধরিয়া অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু ফিরিয়া পাওয়া আর গেল না। এখন তিনি এক ঘোরতর তান্ত্রিক সাধুবাবা! বইখানা কি করিলেন, তিনিই জানেন—কিন্তু চাইতে ভরসা হয় না। তাঁর সিঁদুর মাখানো মস্ত ত্রিশূলটার ভয় করি। এখন তিনি নাগালের বাইরে, মহাপুরুষ, ঘোরতর তান্ত্রিক সাধুবাবা!

দ্বিতীয় 'শুভদা'; প্রথম যুগের লেখা ওটা ছিল আমার শেষ বই অর্থাৎ বড়দিদি, চন্দ্রনাথ, দেবদাস প্রভৃতির পরে।" (ছোটদের মধুকরী, আশ্বিন ১৩৪৫)

এই লেখার কিছুদিন পরেই কিন্তু শরৎচন্দ্র একদিন সামতাবেড়ের বাড়ীতে আলমারীর বই ঘাঁটতে গিয়ে হঠাৎ শুভদার পাণ্ডুলিপিটি দেখতে পেলেন। দেখে বুঝলেন, রামকৃষ্ণবাবু সেদিন তাঁর কাছে মিথ্যা কথা বলেছিলেন এবং পাণ্ডুলিপিটি না পুড়িয়ে এইখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

শুভদার পাণ্ডুলিপি পোড়ানোর ব্যাপারে রামকৃষ্ণবাবুর মিথ্যা কথাটা যে শরৎচন্দ্র জানতে পেরেছেন, এটা রামকৃষ্ণবাবুকে জানাবার জন্যই শরৎচন্দ্র একদিন আলমারীর যে জায়গায় পাণ্ডুলিপিটি লুকানো ছিল, সেইখান থেকে খান কতক বই রামকৃষ্ণবাবুকে নামিয়ে আনতে বললেন।

রামকৃষ্ণবাবু বলেন—মামা হঠাৎ ঐখান থেকে খান কতক বই আনতে বলায় আমি বুঝতে পারলাম, তিনি নিশ্চয়ই শুভদার পাণ্ডুলিপি খানা ঐখানে দেখেছেন, এবং আমি যে মিথ্যা কথা বলেছি, সে বিষয়ে আমাকে শিক্ষা দেবার জন্যই ঐরূপ বলছেন। মামার কথা শুনে ভয়ে আমার বুক কাঁপতে লাগল। যাই হোক, বই নামিয়ে দিয়েই আমি সেখান থেকে সরে পড়লাম। এই ঘটনার পর কয়েক দিন আমি মামার সামনে যেতে সাহস করতাম না।

শরৎচন্দ্র কি ভেবে পাণ্ডুলিপিটি আর পোড়ালেন না, বা নষ্ট করলেন

না। রেখেই দিলেন। হয়ত ভেবেছিলেন, যখন পাণ্ডুলিপিটা রক্ষা পেয়েই গেল, তখন থাক, পরে পারি তো নতুন করে লিখব। কিন্তু সে আর হয়ে ওঠে নি। তাঁর মৃত্যুর পরে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স এ বইটি প্রকাশ করেন।

শরৎচন্দ্র শেষ বয়সে কলকাতায় বালীগঞ্জে বাড়ী করেছিলেন। তাঁর বাড়ীর অদূরেই ছিল কবি-দম্পতি নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবীর বাড়ী। কলকাতায় থাকার সময় শরৎচন্দ্র প্রায়ই এঁদের বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন। রাধারাণী দেবী বলেন যে, তাঁদের বাড়ীতে কখনও কথা প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত ঐ মহিলা সাহিত্যিক মহোদয়ার কথা উঠলে, শরৎচন্দ্র চুপ করে থাকতেন। আর যদিও বা তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতেন, তো অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিতই তাঁর নাম উচ্চারণ করতেন।

ধর্ম্মভাবা, পবিত্র চরিত্রবলসম্পন্না, ঐ মহীয়সী মহিলার প্রতি শরৎচন্দ্র শ্রদ্ধা না জানিয়ে থাকতে পারেন নি।

ব্যর্থ প্রণয়

ব্রহ্ম-প্রবাসী গিরীন্দ্রনাথ সরকারের "ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র" নামে একটি বই আছে। এই বইএর ভূমিকায় গিরীনবাবু লিখেছেন—"শরৎচন্দ্রের সহিত বিদেশে সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর কাল বিশেষ বন্ধুত্ব ও প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ থাকায় তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের অনেক ছোট বড় ঘটনা ও চিত্তাকর্ষক বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।"

এই বইএ সত্যই গিরীনবাবু শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মদেশে অবস্থানের সময়কার অনেক চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তাঁর বইএ "ব্যর্থ প্রণয়ী শরৎচন্দ্র" নামে ৭৪ পৃষ্ঠাব্যাপী এক দীর্ঘ অধ্যায় আছে। কিছু কিছু বাদ দিয়ে গিরীনবাবুর লিখিত সেই কাহিনীটি এখানে উদ্ধৃত করলাম। গিরীনবাবুর লেখাটি এই :—

"শরৎচন্দ্রের প্রণয় ভাগ্য মোটেই ভাল ছিল না। তাঁহার প্রথম জীবনের প্রণয়ঘটিত নৈরাশ্যের কথা সকলেই অবগত আছেন। তাঁহার আর একটি ব্যর্থ প্রণয়ের অপূর্ব কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায় নিম্নোক্ত ঘটনার মধ্য হইতে।

রেঙ্গুন সহরে বাঙ্গালী সমাজের নেতা ও জননায়ক কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি।...ব্রহ্মদেশে নবাগত ব্যক্তিদিগের জন্য তাঁহার বাটির দ্বার সরাইখানার ন্যায় সর্বদাই উন্মুক্ত থাকিত।...এই স্বনামধন্য উদারচরিত মহাপুরুষের স্নেহময়ী সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীও স্বামীর ন্যায় অশেষ গুণসম্পন্না নারী ছিলেন।...বাল্যকাল হইতে ইঁহাদের সংস্পর্শে আসায় আমি কুঞ্জবাবুর স্ত্রীকে দিদি বলিতাম, তিনিও আমাকে সহোদরাধিক স্নেহ করিতেন। একদিন মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রণ খাইয়া তাঁহাদের বাটী হইতে ফিরিতেছি,

এমন সময় বাটীর সম্মুখে একখানা ঠিকা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে দুইজন যুবক ও একজন ভদ্রমহিলা অবতরণ করিলেন। তাঁহাদের জিনিষপত্র দেখিয়া বুঝিলাম, তাঁহারা কলিকাতা হইতে আসিতেছেন এবং এই বাড়ীতে অতিথি হইবেন।

কুঞ্জবাবু বাড়ীতে ছিলেন না, আমি মহিলাটিকে উপরের সিঁড়ি দেখাইয়া দিয়া দিদিকে ডাকিয়া দিলাম। তিনি এই পরমা সুন্দরী যুবতীটিকে সম্ভ্রান্ত বংশের কুলবধূ ভাবিয়া যথোচিত আদর যত্ন করিলেন। নীচে সাহেববেশী সুন্দর যুবক দুইজনের সহিত আলাপ পরিচয় করায় একজন বলিলেন—আমরা স্বামী-স্ত্রীতে দেশ ভ্রমণে এসেছি, আর আমার গ্রাজুয়েট বন্ধুটি চাকরীর অন্বেষণে বাহির হ'য়েছেন।...

এ বাড়ীর রীতি অনুযায়ী অতিথি যুবকদ্বয় রাত্রে নীচের ঘরে এবং গায়ত্রী (তাহাদের সঙ্গের মেয়েটি) উপরে মেয়েদের সঙ্গে শয়ন করিল।

দিদি প্রথম দিন হইতেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, গায়ত্রী খুব শান্ত ও সরল প্রকৃতির মেয়ে। তরুণ যৌবনের স্নিগ্ধ লাবণ্যে সে অপরূপ সুন্দরী হইলেও তাহার বেশভূষার কোন পারিপাট্য ছিল না, প্রায়ই অন্যমনস্কভাবে থাকিত ও সময়ে সময়ে একাকী নিভৃতে বসিয়া কাঁদিত, কার্য উপলক্ষে তাহার স্বামী সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে, যাইতে অস্বীকার করিত। তাহার পাণ্ডুর মলিন মুখখানি, অসংযত নূতন বেশভূষা, সিঁথিতে নূতন সিন্দুরের চিহ্ন দিদির চক্ষু কিছুতেই এড়াইতে পারিল না।...তিনি একদিন গায়ত্রীকে নির্জনে ডাকিয়া সস্নেহে কহিলেন—আমি তোমার মায়ের বয়সী, মার কাছে মেয়ের কোন কিছু গোপন রাখা উচিত নয়, তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার মনের কষ্টের কথা আমাকে বলতে পার।—গায়ত্রীর বুকের ভিতর অসহ্য বেদনায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল, সে প্রবল অশ্রু বেগ দমন করিতে না পারিয়া আঁচলে মুখ ঢাকিয়া

কাঁদিয়া ফেলিল এবং এই আশ্রিত-বৎসলা মহীয়সী গৃহকর্ত্রী ভিন্ন এই আসন্ন বিপদে তাহাকে রক্ষা করিবার আর কেহ নাই ভাবিয়া তাহার পথভ্রষ্ট জীবনের মর্মান্তিক দুঃখ কাহিনী অকপটে বলিয়া ফেলিল।

সে সম্ভ্রান্ত ঘরের ব্রাহ্মণ কন্যা, বাল্যে মাতৃহারা; কৈশোর ও যৌবনের মধ্যস্থলে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু বিবাহিত জীবনের সুখ সৌভাগ্য তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বিবাহের অতি অল্পকাল পরেই সে স্বামীহীনা হয়। বিধবা অবস্থায় পিতৃগৃহেই সে ছিল। পিতা বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়া তাহার সমবয়সী বিমাতাকে গৃহে আনায় তাহার দুঃখের মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছিল। বিমাতা সপত্নী-কন্যাকে সচরাচর যে দৃষ্টিতে দেখে, তাহার অদৃষ্টে তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বিমাতার চক্ষুঃশূল হইয়া নানা নির্যাতন ভোগে যখন জীবনভার দুর্বিষহ বোধ হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে এই প্রতিবেশী যুবকের দুর্ভেদ্য কুহকে ভুলিয়া সে বাটির বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ঐ হ্যাটকোট পরা গৌরবর্ণ যুবকটি তাহার স্বামী নয়, প্রতিবেশী।

দিদি গায়ত্রীর এই কথাগুলি শুনিয়া বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিলেন। ...কুঞ্জবাবু একথা শুনিলে কি মনে করিবেন, এই কথা পাঁচজনের কানা-কানি হইলে সমাজে তাঁহাদের কত অখ্যাতি হইবে, এই সমস্ত ভাবিয়া তিনি নবাগত অতিথিদের আর একদিনও বাড়ীতে স্থান দেওয়া সমীচীন বিবেচনা করিলেন না।

সন্ধ্যার পর কুঞ্জবাবুর ভৃত্য আসিয়া আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেল, দিদির মুখে এই সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম।

কুঞ্জবাবুর নিকট অতিথি নারায়ণ। তিনি নিজমুখে কিছু বলিতে পারিবেন না। দিদি ও আমি একত্রে পরামর্শ করিয়া কুঞ্জবাবুর নির্দেশ অনুসারে যুবকদ্বয়কে অন্যত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া চলিয়া যাইতে

বলিলাম। তাঁহারা মাত্র কয়েক দিন আসিয়াছেন, রেঙ্গুন শহরের কোনদিকে সস্তায় বাড়ী ভাড়া পাওয়া যাইবে একটু নির্দেশ দিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইবেন, বলায় আমি সাহেব বেশী যুবকের হস্তে শরৎচন্দ্রকে একখানি পত্রে লিখিয়া দিলাম—শরৎদা, পত্রবাহক ভদ্রলোকটি কুঞ্জবাবুর বাড়ীর নবাগত অতিথি, এঁরা স্বামী-স্ত্রী ও একটি বন্ধু, তিনজনে সংকুলান হয়, এমন একটি ছোট বাড়ী তোমাদের অঞ্চলে এঁদের ভাড়া করে দিতে পারবে কি? কাল সকালে অতি অবশ্য আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রো, বিশেষ গোপনীয় কথা আছে।—ইতি তোমার গিরীন।

অবলা, অত্যাচারিতা ও পতিতা স্ত্রীলোকদিগের জন্য প্রকৃতই শরৎচন্দ্রের প্রাণ কাঁদিত। তাঁহার দুর্বলতা বা জীবনের বৈচিত্র্য ছিল ঐখানে যে, তিনি সম্ভবতঃ ঐ সকল নারীজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সংগ্রহের জন্য বহুদিন তাহাদের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন। বোধ হয় ঐ সকল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শরৎচন্দ্রের ভবিষ্যৎ সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

গায়ত্রী-ঘটিত এই ব্যাপারটি শরৎচন্দ্রের গবেষণায় একটি নূতন খোরাক হইবে ভাবিয়া, আমি তাঁহাকে আমার সহিত দেখা করিতে লিখিয়াছিলাম।

শরৎচন্দ্র আসিলে এই ঘটনাটি বলিয়া তাঁহাকে বলিলাম—শরৎদা, এই কেসটি তদ্বির করতে তোমার চেয়ে বড় কৌঁসুলি রেঙ্গুনে আর কেউ নেই জেনে তোমার হাতে কেসটা দিলাম।

এই কৌতূহলপূর্ণ কাহিনী শুনিয়া শরৎচন্দ্রের ঔৎসুক্য বাড়িয়া গেল, তিনি হাসিতে হাসিতে তখনই কুঞ্জবাবুর বাড়ীতে গিয়া উহাদের সহিত আলাপ করিয়া ফেলিলেন এবং নিজ পল্লীর সন্নিকটে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া উহাতে লইয়া গেলেন। শরৎচন্দ্রের ছিল অন্তর্ভেদী

দৃষ্টি, মানুষকে চিনিবার অসামান্য ক্ষমতা, তিনি এই যুবকদ্বয়কে দেখিয়াই ব্যাপারটা বুঝিয়া লইলেন এবং পরিহাসচ্ছলে উভয়ের মিঃ হাজব্যাণ্ড ও মিঃ ফ্রেণ্ড নাম দিলেন। হাজব্যাণ্ড একটি মাকাল ফল, ধনীগৃহের চরিত্রহীন যুবক, আর ফ্রেণ্ড বেচারী অত্যন্ত নিরীহ, ধর্মভীরু ও সুশিক্ষিত লোক। সে অবস্থা বিপর্যয়ে চাকরীর অন্বেষণে রেঙ্গুনে আসিতেছিল, জাহাজে হাজব্যাণ্ড তাহাকে সাথী করিয়া লইয়াছে।

দিদির স্নেহ, যত্ন ও ভালবাসায় গায়ত্রীর এই কয়েকদিন একরূপ নির্ভয়ে কাটিতেছিল, এখন এখান হইতে চলিয়া গেলে ঐ দুর্বৃত্তের সহবাসে থাকিতে হইবে, এই দুশ্চিন্তায় তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত জল হইয়া গেল। অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া সে সারা রাত্রি ঘুমায় নাই, নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিয়াছে, জীবনের এক দুর্বল মুহূর্তে অপরিণামদর্শিতার জন্য একটি ভুল করিয়া সে লোক দৃষ্টিতে কতদূর ঘৃণিত ও কলঙ্কিত হইয়াছে ভাবিয়া তাহার সমস্ত অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, দিদির পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যথিত কণ্ঠে কহিল—মা, আপনি অনেকের আশ্রয়দাত্রী, আমাকে একটু আশ্রয় দিন।—দিদির স্নেহপ্রবণ হৃদয়বেগে উছলিয়া চোখে জল বাহির হইল, গায়ত্রীকে কোলে টানিয়া লইয়া সান্ত্বনা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁ মা, তোমায় যগুপি কোন ভদ্র পরিবারের সঙ্গে দেশে পাঠিয়ে দিই, তোমার বাবা নেবেন কি?

গায়ত্রী বলিল, আমি নিষ্কলঙ্ক জানলে তিনি হয়ত পায়ে ঠেলবেন না।

দিদি বলিলেন, তবে সেই ভাল, তোমার বাপের ঠিকানা দাও, তাঁকে চিঠি লিখে তাঁর মত কি জানি।

গায়ত্রী বলিল, মা, আমার এখন ডাঙ্গায় বাঘ ও জলে কুমীরের অবস্থা! দেশে ফিরলে বাঘিনী সৎমা খেয়ে ফেলবেন আর এখানে থাকলে দুর্বৃত্তের হাতে সর্বনাশ সুনিশ্চিত।

দিদি বলিলেন, তুমি কি রেঙ্গুনে ইচ্ছা ক'রে এসেছ ?

গায়ত্রী বলিল, না, লক্ষ্ণৌতে আমার মেসোমহাশয়ের বাড়ী নিয়ে যাবার ছল ক'রে একেবারে জাহাজে তুলেছে। জাহাজেই ওর অসদিচ্ছা বুঝতে পেরেছি, আমি অন্য মেয়েদের সঙ্গে লেডিজ কেবিনে ছিলাম, আর এ কদিন আপনাদের আশ্রয়ে কেটে গিয়েছে, দুষ্ট দুরভিসন্ধি পূরণের সুযোগ পায়নি। আমার বাবার চিঠি আসা পর্যন্ত আমি এখানে থাকতে পারি কি ?

দিদি বলিলেন, তোমার প্রতিবেশী যুবকটি তোমাকে তার স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে আমাদের বাড়ীতে উঠেছেন, এখন এ কেলেঙ্কারীর কথা প্রকাশ হ'লে, তিনি যে হীন কলঙ্কের সৃষ্টি করবেন, সেটা আমাদের মান সম্ভ্রমের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর, এমন কি সমাজে আমাদের মুখ দেখাবার জো থাকবে না।...

যুবকদের বিদায়ের সময় আমাকে উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল।

নীচে দুই বন্ধুতে গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল ; গায়ত্রী লাল সাড়ী, সিন্দুর অলঙ্কার প্রভৃতি সধবার ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া বিধবার বেশে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া গাড়ীতে বসিল। হাজব্যাণ্ড নবসাজে সজ্জিত গায়ত্রীকে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

যাহাকে আশ্রয় দেওয়া যায়, তাহাকে নিজ আত্মীয় স্বজনের মত রক্ষা করা উচিত, দিদি ইহা বিশেষরূপে জানিতেন ; কিন্তু সমাজে খাটো হইবার ভয়ে, তিনি এ অবস্থায় গায়ত্রীকে আশ্রয় দিতে পারিলেন না বলিয়া আন্তরিক দুঃখিত হইলেন। বিদায়ের পূর্বে সমবেদনা জানাইয়া বলিলেন—কোন ভয় নেই মা, কোন কিছু কষ্ট হ'লে আমায় খবর দিও, মা সর্বমঙ্গলা তোমায় রক্ষা করবেন।

তাহাদের গাড়ী সহরের প্রান্ত ভাগে লোয়ার পোজনডংএ আসিয়া

পৌঁছিল। শরৎচন্দ্র উহাদের নির্দিষ্ট বাড়ীতে নামাইয়া বাসোপযোগী সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

সালঙ্কারা ও সুবেশে ভূষিতা গায়ত্রীকে হঠাৎ বিধবার বেশ পরিবর্তন করিতে দেখিয়া ফ্রেণ্ড অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিল, তাহার পর শরৎচন্দ্রের মুখে প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইয়া হাজব্যাণ্ডের প্রতি তাহার মনে যুগপৎ ঘৃণা ও ক্রোধের উদ্রেক হইল। তাহার মনের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া সে এক্ষণে গায়ত্রীকে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। গায়ত্রী এই নির্ভীক তেজস্বী যুবককে ভগবানপ্রেরিত রক্ষক ভাবিয়া যথেষ্ট সম্মান করিত। ফ্রেণ্ডও গায়ত্রীর গুণমুগ্ধ হইয়া এই একান্ত নির্ভরশীলা রমণীর প্রতি অপরিশীম শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিতে ক্রটি করিত না। ইহাদের কাঠের বাড়ীতে মাত্র দুইখানি ঘর ও একটি ছোট রান্নাঘর ছিল, অতিকষ্টে তিন জনের স্থান সঙ্কুলান হইত। হাজব্যাণ্ড ও ফ্রেণ্ড উভয়ে একখানি ঘরে শুইত, অপরখানিতে গায়ত্রী দরজা বন্ধ করিয়া থাকিত। হাজব্যাণ্ডের মনে কলুষ-কামনার বহ্নি সর্বদাই জ্বলিত। সে নীচ দুরভিসন্ধি পূরণের জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু গায়ত্রীকে সর্বদা বিমর্ষ ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ দেখিয়া ভয়ে কোন কথা বলিতে পারিত না।...

একদিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর হাজব্যাণ্ড ও ফ্রেণ্ড বসিয়া গল্প করিতেছিল, এমন সময় শরৎচন্দ্র আসিয়া ফ্রেণ্ডকে তাঁহার বাসায় ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ফ্রেণ্ড ফিরিয়া আসিয়া সোৎসুক নেত্রে দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, দরজা অর্গলবদ্ধ, ভিতর হইতে ভীষণ কলহের শব্দ শোনা যাইতেছে, দুশ্চরিত্র হাজব্যাণ্ড গায়ত্রীকে নির্জনে একা পাইয়া তাহাকে নানা ভাবে লাঞ্ছিত করিবার ভয় দেখাইতেছে। গায়ত্রীও হীন কলঙ্কিত জীবন যাপন অপেক্ষা এখনই আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালার অবসান করিবে বলিয়া

নির্ভীকভাবে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। ব্যাপারটি ক্রমেই গুরুতর দাঁড়াইতেছে বুঝিয়া, ক্রেণ্ড ছুটিয়া শরৎচন্দ্রকে ডাকিয়া আনিল। শরৎচন্দ্র আসিয়া মধ্যস্থতা করিতে চাহিলে, হাজব্যাণ্ড উত্তেজনার বশে তাঁহাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়া মারিতে উদ্যত হইল। শরৎচন্দ্র সেই রাত্রে একখানি গাড়ী করিয়া আমার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমাকে তাঁহার অপমানের প্রতিশোধ লইতে ও দুর্বৃত্ত হাজব্যাণ্ডের হাত হইতে অসহায়া গায়ত্রীকে উদ্ধার করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। দুষ্টের দমন ও বন্ধুর সাহায্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য জানি, কিন্তু এ সমস্ত কাজে সাহস অপেক্ষা গায়ের জোর ও বুদ্ধিরই বেশী দরকার। কি উপায়ে পাষণ্ড-দমন কার্যে অগ্রসর হইব ভাবিতেছি, হঠাৎ আমার অফিস টেবিলের উপর একখানি ডাকের চিঠি পড়িয়া আছে দেখিলাম। চিঠিখানির শিরোনামায়—'শ্রীযুক্ত নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কেয়ার অফ মিষ্টার কে, বি, ব্যানার্জি, য়্যাড্‌ভোকেট রেঙ্গুন' লেখা আছে। বুঝিলাম, হাজব্যাণ্ড ওরফে আমাদের নন্দদুলালের এই পত্রখানি ডাকে কুঞ্জবাবুর অফিসে আসিয়াছিল, তিনিই ঐ খানি আমার বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন। দৈব কৃপায় অপ্রত্যাশিতভাবে চিঠিখানি পাইয়া শরৎচন্দ্র খুলিয়া পড়িলেন। চিঠিখানি নন্দদুলালের মা ভবানীপুর হইতে লিখিয়াছেন। লেখা আছে :—'বাবা দুলাল, তুমি নিরাপদে রেঙ্গুনে পৌঁছেছ, শুনে আনন্দ হ'ল। তুমি কবে আসবে? তুমি যেদিন ভোরবেলায় রওনা হ'য়েছ, সেই রাত্রি থেকেই আমাদের প্রতিবেশী নবীন মুখুয্যের বিধবা মেয়ে গায়ত্রীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তার বুড়ী পিসী শোকে অধীর হ'য়ে পড়েছে। আমার বড় ভয় হ'য়েছে পাছে তোমার নামে কিছু বদনাম রটে। তোমার আর বেশী দিন একলা বিদেশে থেকে কাজ নেই, পত্র পাঠ চলে এস।'—ইতি তোমার দুঃখিনী মা'

হাজব্যাণ্ডের কীর্তি আমাদের জানাই ছিল, এক্ষণে এই পত্রখানিতে সমস্তই স্পষ্ট হইয়া গেল। একা শরৎচন্দ্রের সহিত যাইব কিনা ভাবিতেছি, এমন সময় নিরুপায়ের উপায় ভগবান, নিরাশ্রয়া গায়ত্রীকে রক্ষা করিবার এক সহজ উপায় করিয়া দিলেন। রেঙ্গুন সেবক ও সংকার সমিতির কোন কার্যোপলক্ষে আমার বিশিষ্ট বন্ধু রায় সাহেব নিবারণচন্দ্র মুখার্জি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। হাজব্যাণ্ড-গায়ত্রী ঘটিত সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল এবং তিনি আমাদের সঙ্গী হইয়া সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এই সাহসী ও শক্তিশালী বন্ধুটি ও আমার একটি বলিষ্ঠ হিন্দুস্থানী দরওয়ানকে সঙ্গে লইয়া আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে শরৎ-পল্লীর দিকে যাত্রা করিলাম। শরৎচন্দ্রের মুখে পূর্বে যে পল্লীর বহু বিচিত্র গল্প শুনিয়াছিলাম, আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সভয়ে তাহার মধ্যে অগ্রসর হইলাম। সহসা সম্মুখে অশনিপাত হইলে যেমন বিস্ময়ে জড়ীভূত হয়, শরৎচন্দ্রকে এত রাত্রে লোকজন সমভিব্যাহারে আসিতে দেখিয়া হাজব্যাণ্ড সেরূপ চমকিয়া উঠিল এবং নিবারণবাবুর বলিষ্ঠ গঠন ও রুদ্র মুখ দেখিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। তখন শরৎচন্দ্র বিদ্রূপাত্মক মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন—এই নাও, বাবা নন্দদুলাল, তোমার মায়ের চিঠি। বুড়ো নবীন মুখুয্যের সর্বনাশ করে তার বিধবা মেয়েটিকে বের করে এনেছ! এখন হাতে কয়েদীর বালা আর গলায় জুতার মালা পরিয়ে তবে তোমায় ছাড়ব। কুঞ্জবাবুর বাড়ীতে নাম ভাঁড়িয়ে ছদ্মবেশে উঠেছিলে, এত বড় স্পর্দ্ধা।

হাজব্যাণ্ড প্রথম চিঠির কথা শুনিয়া বিস্ময়ে হতভম্ভ হইয়া গেল, থতমত খাইয়া কোন জবাব দিতে পারিল না। কতকক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ করিয়া শরৎচন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া আরক্তমুখে কর্কশকণ্ঠে কহিল— Who the devil you are to interfere in my affair?

শরৎচন্দ্রের শরীরে বল বেশী না থাকিলেও কণ্ঠে বিলক্ষণ জোর ছিল। তিনি দম্ভের সহিত বলিলেন—We have come to teach you a lesson, Damn Scoundrel !

বারুদে অগ্নিসংযোগের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়া ক্ষিপ্রগতিতে দাম্ভিক হাজব্যাণ্ড প্রচণ্ড বেগে শরৎচন্দ্রকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার মুখে ২।৩টি ঘুসী লাগাইয়া দিতেই নিবারণবাবু ক্রোধকম্পিত স্বরে—বটে এতদূর স্পর্দ্ধা ? পাজী বদ্‌মাইস্! আজ তোকে খুন করে ফেলব—বলিয়া মুহূর্তের প্রবল উত্তেজনায় এমন জোরে তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া ঝাঁকানি দিলেন যে, সে ভীষণ আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ গোঁঙাইবার পর তাহার গলার শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিল, চক্ষু বাহির হইয়া আসিল. সে সংজ্ঞাহীন অবশ হইয়া পড়িল। তাহার সমস্ত শরীর নিস্তব্ধ ও মুখ মড়ার মত ফ্যাকাসে দেখিয়া শরৎচন্দ্র ভয়ে ডাক্তার ডাকিতে ছুটিলেন।···

সকালে বিছানায় উঠিয়া বসিলে শরৎচন্দ্র যত্নের সহিত হাজব্যাণ্ডকে চা রুটি খাইতে দিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—আজ এখনই দু তিন ঘণ্টা পরে কলকাতার জাহাজ ছাড়বে, সেই জাহাজে তোমাকে যেতে হ'বে, আমরা গিয়ে তুলে দেব।···

নৈরাশ্যে ম্রিয়মান হাজ্‌ব্যাণ্ড এই সংবাদে বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া গেল। একটা অবসন্ন বিমূঢ়তায় তাহার গলায় স্বর যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, সে একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—যাবার আগে একবার গায়ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে দেবেন কি ?—নিবারণবাবু বলিলেন—তুমি শুধু পাপিষ্ঠ নও, অতি নির্লজ্জ! এখনও গায়ত্রীর কথা ? ফের গায়ত্রীর নাম মুখে আনলে কঠিন শাস্তি পাবে। যদি ভাল চাও শীঘ্র নিজের জিনিষপত্র গুছিয়ে নাও, জাহাজ ছাড়বার সময় হ'য়ে এল।

সারারাত্রি অনিদ্রায় শরীর অবসন্ন হইয়াছিল, এ নাটকের এ অঙ্কের অভিনয় যত শীঘ্র শেষ হয় ততই মঙ্গল, ইহা বিবেচনা করিয়া শরৎচন্দ্র দরওয়ানের সাহায্যে হাজব্যাণ্ডের বিছানাপত্র বাঁধিয়া একখানি গাড়ী ডাকিয়া আনিলেন। ফ্রেণ্ড, নিবারণবাবু, আমি ও শরৎচন্দ্র সকলেই তাহাকে জাহাজে তুলিয়া দিবার জন্য যাত্রা করিলাম, গায়ত্রী একাকিনী গৃহে রহিল।

অপমান-ক্ষুব্ধ হাজব্যাণ্ড ক্ষুণ্ণমনে ফাঁসী কাষ্ঠের আসামীর ন্যায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধীরে ধীরে আমাদের অনুসরণ করিল।

শিকার হাত ছাড়া হওয়ায় নৈরাশ্য, দুঃখ ও অপমানে এক রাত্রেই হাজব্যাণ্ডের চেহারার পরিবর্তন হইয়াছে, তাহার গৌরবর্ণ উজ্জ্বল মুখখানি শুষ্ক ও মলিন হইয়া গিয়াছে। শরৎচন্দ্রের প্রতি তাহার আক্রোশের অবধি ছিলনা, তাহার এই প্রেম-ঘটিত ব্যাপারে বিষম প্রতিবন্ধক শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র তাহার বাড়া ভাতে ছাই দিয়াছে, গায়ত্রীকে সমুদ্র পারে আনিয়াও তাহার অভীষ্ট পূরণ হইল না, এজন্য দায়ী নিষ্ঠুর: শরৎচন্দ্র।

জাহাজে উঠিবার সময় সে স্বাভাবিক ক্রোধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রকে শাসাইয়া বলিল—যদি কলকাতায় কখনও তোমাকে পাই, দেখে নেব।

জাহাজ ছাড়িয়া দিল। নর-পশুর হস্ত হইতে গায়ত্রীকে উদ্ধার করিয়া শরৎচন্দ্র আনন্দের আতিশয্যে আমাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন। শরৎচন্দ্র ও রায় সাহেব যে যাঁহার বাসায় চলিয়া গেলেন। ফ্রেণ্ড আমাকে ছাড়িল না, উভয়ে কথাবার্তা কহিতে কহিতে তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে পৌঁছাইতেই রোরুদ্যমানা ক্ষীণ নারীকণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। অদৃষ্টের দারুণ পরিহাসে ভাবনা ও উৎকণ্ঠায় গায়ত্রী সারা রাত্রি নিদ্রা যায় নাই, ভবিষ্যতে তাহার অদৃষ্টে কি আছে সেই চিন্তায় অস্থির।

ফ্রেণ্ড আমাকে বলিল, যখন এদিকে এ'সেছেন তখন গায়ত্রীকে একবার দেখে যাওয়া উচিত।

ফ্রেণ্ডের ডাকে গায়ত্রীর চমক ভাঙ্গিল, গিরীনবাবু এসেছেন, শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিয়া দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, আমি কি বলিব, তাহা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। তাহার চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতেছিল।

তাহার অসহায় অবস্থা ও অপরিসীম দুঃখের কথা ভাবিয়া আমি কহিলাম—মা, ভগবানের কৃপায় আপদ বিদায় ক'রে এ'সেছি, উপস্থিত আর কোন ভয় নেই। তোমাদের সঙ্গী এই পাঁচকড়িবাবুকে আমরা ফ্রেণ্ড বলে ডাকি ইনি অতি ধীর ও শান্ত প্রকৃতির লোক, ওঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে বুঝতে পেরেছি উনি একজন সচ্চরিত্র যুবক, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত, ওঁর মন বড় পবিত্র। ওঁর আশ্রয়ে মা ও ছেলের মত তোমাকে কিছুদিন থাকতে হবে। শরৎবাবু ব'লে আমার আর একটি বন্ধু রাত্রে এসে ওঁর সঙ্গে শোবেন। তিনিও শিক্ষিত, পরোপকারী ভদ্র সন্তান, তোমাদেরই প্রতিবাসী। মা জগদম্বাকে খুব ডাক, তিনি নিশ্চয়ই সদয় হবেন।

আমার মাতৃসম্বোধনের সুরের আন্তরিকতায় গায়ত্রীর অনেকটা লজ্জা কাটিয়া গিয়াছিল, সে কম্পিতকণ্ঠে দরজার পার্শ্ব হইতে জিজ্ঞাসা করিল—আমার বাবার কোন চিঠি পত্র এসেছে কি?

আমি বলিলাম—না মা, এখনও তাঁর চিঠিপত্র আসে নাই। তোমার মেসোমহাশয়ের ঠিকানাটি আমাকে লিখে দাও, আমি লক্ষ্ণৌতে তাঁকে লিখ্‌ব।

তাহার পর সময়োপযোগী দু' একটি উপদেশ দিয়া ও গায়ত্রীর মেসোমহাশয়ের ঠিকানাটি লইয়া কুঞ্জবাবুর বাড়ীতে আসিলাম। দিদি গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা শুনিলেন এবং পিঞ্জরাবদ্ধ গায়ত্রীর দুঃখ

স্মরণ করিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—মেয়েটি যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! আহা, বেচারীর কপালে এতও ছিল!

দুঃখে, কষ্টে, ক্ষোভে, পাছে গায়ত্রী রান্না করিতে না পারে, ইহা ভাবিয়া তিনি পাচক ব্রাহ্মণ দ্বারা দু'জনের খাবার পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে যে নাপিতানী আল্‌তা পরায় তাহাকে প্রত্যহ রাত্রে গিয়া গায়ত্রীর কাছে শুইতে বলিয়া দিলেন। এই নাপিতানীর দ্বারা তিনি গায়ত্রীর সংবাদ লইতেন এবং মধ্যে মধ্যে ভাল আহার্য সামগ্রী পাঠাইয়া দিতেন।···

গায়ত্রীর দুঃখ দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শরৎচন্দ্র একদিন আমাকে বলিলেন—তোমার দিদিকে বলো তিনি যেন গায়ত্রীকে দেশে পাঠাবার জন্য ব্যস্ত না হন। এই বাঙ্গালী মেয়ে-জাতটা যতক্ষণ ঘরে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ সহজে এদের সাড়া পাওয়া যায় না, কিন্তু একবার ঘরের বাহির হ'লে আর রক্ষে নেই, তখন হয়ত এক লাফে একেবারে দুঃসাহসিকতার চরম সীমায় পৌঁছে যাবে। গায়ত্রীর প্রকৃত মনোভাব কি, জানবার জন্য আমি দিন কতক তাকে 'ষ্টাডি' করতে চাই।

আমি বলিলাম—তোমার মাথা করতে চাও। কাল কেউটের সম্মুখীন হওয়া বা জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে ছিনিমিনি খেলা কি সহজ কথা? আমার ঘাড় থেকে এ বোঝা নেমে গেলেই বাঁচি। আমি ওর বাপের চিঠির জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত হ'য়ে আছি।

শরৎচন্দ্র প্রত্যহ রাত্রে ফ্রেণ্ডের সঙ্গে একত্র শয়ন করেন এবং ইদানীং উহাদের সহিত খুবই ঘনিষ্ঠতা করিতেছেন শুনিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। এই সমাজ-বিরোধী উচ্ছৃঙ্খল যুবক সম্প্রতি গায়ত্রীকে 'ষ্টাডি' করিতে চায় বলিয়া যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছে, তাহা ভয়াবহ! কত কষ্টে এক পাষণ্ডের হস্ত হইতে গায়ত্রীকে উদ্ধার

করিয়াছি, আবার এই খেয়ালী শরৎচন্দ্র খেয়ালের বশে কখন কি করিয়া ফেলিবে ভাবিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম।...গায়ত্রীর প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধাভাব ক্রমে অন্ধ ভালবাসায় পরিণত হইল।...

এই সময় শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক ধনী কাঠের ব্যবসায়ী রেঙ্গুনে আসেন।...তাঁহার একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী আবশ্যক হওয়ায় তিনি মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে ক্রেগুকে কেরাণী নিযুক্ত করিলেন।...

একদিন হঠাৎ কার্যোপলক্ষে শশাঙ্কবাবু ক্রেগুর বাড়ীর সন্ধানে আসিতেছিলেন, দূর হইতে একটি ছোট গৃহের বারান্দায় দেখিলেন, অনিন্দ্য-সুন্দরী গায়ত্রী আয়ত লোচনে উদাস দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে চাহিয়া আছে।...এইটি ক্রেগুর বাড়ী শুনিয়া তিনি অনুসন্ধানে জানিলেন, ক্রেগু এখনও কর্মস্থল হইতে ফিরে নাই।

শশাঙ্কবাবু সেদিন বাড়ী ফিরিয়াও গায়ত্রীর সে রূপ ভুলিতে পারিলেন না, তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। তাঁহার চরিত্র সবিশেষ দুষ্ট না হইলেও, পবিত্র ছিল না।

এই সূত্র অবলম্বন করিয়া শশাঙ্কবাবুর ক্রেগুর বাড়ীতে গতি-বিধি বাড়িয়া গেল।...তাঁহার হৃদয়ের অদম্য লালসা ও বিপুল চিত্তবেগ তিনি কিছুতেই দমন করিতে না পারিয়া একদিন ধরণীর মাকে ডাকিয়া গোপনে ক্রেগুর বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। ধরণীর মা, শশাঙ্ক-বাবুর কর্মে নিযুক্ত লোহার মিস্ত্রীর রক্ষিতা।

ধরণীর মা গায়ত্রীর কাছে আসিয়া কথায় কথায় তাহার উপর শশাঙ্কবাবুর আকস্মিক কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে জানাইল এবং তাঁহার বিপুল ধন-সম্পত্তি ও গায়ত্রীর ভবিষ্যৎ ভাগ্যের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। যে কলুষের পঙ্কে মগ্ন হইয়া আছে, নিষ্কলঙ্ক পবিত্র জীবনের মর্ম সে কি বুঝিবে? গায়ত্রী তাহার কথা শুনিয়া ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল।

গায়ত্রী এতদিন পর্যন্ত তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের দুঃখ ভাল করিয়া অনুভব করে নাই। দুইটি মানুষ তাহার রূপ-মুগ্ধ হইয়া জীবনের নিশ্চিন্ততার অবসান করিতে চায়। একজন তাহার জন্য লাঞ্ছনা ও নৈরাশ্যের বোঝা মাথায় লইয়া পলাইতে বাধ্য হইয়াছে। অপর একজন তাহাকে ধনৈশ্বর্যের প্রলোভন দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিতে চায়। তাহার মনে দারুণ আশঙ্কা মেঘের মত ধূমায়িত হইয়া উঠিল।

ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার উদ্দেশ্যে শশাঙ্কবাবু মধ্যে মধ্যে লেংড়া আম, লিচু, পটল প্রভৃতি রেঙ্গুনে দুষ্প্রাপ্য ফল-মূল কলিকাতা হইতে আনাইয়া মিষ্টান্নের সহিত প্রচুর পরিমাণে ফ্রেণ্ডের বাটিতে উপঢৌকন পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। নির্বিকার-চিত্তে ফ্রেণ্ড তাহার অধিকাংশ দ্রব্যই আমার বাটিতে পাঠাইয়া দিত এবং তাহার মনিবের অযাচিত করুণার অজস্র প্রশংসা করিত।

শরৎচন্দ্র সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া প্রমাদ গণিলেন। তিনি রূপে, অর্থে, সামর্থ্যে, শঠতা বা প্রবঞ্চনা কিছুতেই শশাঙ্কবাবুর সমকক্ষ নহেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে বিদেশে কত বিভিন্ন দেশের ও ভিন্ন প্রকৃতির লোকের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু শশাঙ্কবাবুর মত ধূর্ত ও অদ্ভুত চরিত্রের লোক তিনি এ পর্যন্ত দেখেন নাই। এক্ষেত্রে উভয়ে সমগুণবিশিষ্ট ও সমধর্মী হইলেও শরৎচন্দ্র ভাবিলেন, আকাশের চাঁদে ও মর্তের খাদ্যোতিকায় যে প্রভেদ, তাঁহাতে ও শশাঙ্কবাবুতেও সেই প্রভেদ।

এক প্রণয়ের পাত্রীকে দুইজন প্রণয়ীর সমভাবে আকর্ষণ করা সম্ভবপর নহে। একের সমগ্র ভালবাসা লাভ করিতে হইলে অপরকে সরাইতে হইবে। নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে শরৎচন্দ্রের আশা ও আনন্দ একেবারে নিভিয়া যাইতে বসিল।

গায়ত্রীর পিতার পত্র আসিয়াছে, চিঠিখানি পড়িয়া আমি গায়ত্রীকে

পাঠাইয়া দিলাম।…তাহার স্নেহময় পিতা তাহাকে কুলটা আখ্যা দিয়া কালাপানির জলে প্রাণ বিসর্জন দিতে আদেশ দিয়াছেন! …নিজের অদৃষ্টকে সহস্র ধিক্কার দিয়া স্থির করিল, এ অভিশপ্ত জীবন সে ইরাবতীর জলে বিসর্জন দিবে।…

শশাঙ্কবাবু ক্রেঙের নিকট গায়ত্রীর বিষয় আনুপূর্বিক সমস্ত শুনিয়া মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং প্রকাশ্যে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—আমি কলকাতায় ফিরে যাবার সময় ওঁকে নিয়ে ঢাকার নারী আশ্রমে রেখে দেব।

তারপর তাঁহারা কেন এই কদর্য পল্লীতে বাস করেন এবং শরৎবাবু কেন রাত্রে তাঁদের বাটিতে শয়ন করেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া বলিলেন—আমার কাজের সুবিধার জন্য এ অঞ্চলে একটি আফিস খোলা আবশ্যক হয়েছে। আমি টম্‌সন্ ষ্ট্রীটে মাসিক ১০০৲ শত টাকা ভাড়ায় একটি বড় বাড়ী ভাড়া করেছি, সেথায় অনেক ঘর-দুয়ার আছে। নীচে আমার স্বতন্ত্র আফিস ও থাকবার বন্দোবস্ত হবে, উপরে আপনি ও গায়ত্রী দেবী থাকতে পারবেন। পাচক, ব্রাহ্মণ, দাসদাসী, খাওয়া দাওয়া সমস্তই এক সঙ্গে হ'বে। উপস্থিত সংসার চিন্তার হাত থেকে আপনি নিষ্কৃতি পাবেন।

দয়ালু মনিবের কৃপায় এইরূপে অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত হইবে ভাবিয়া ক্রেঙ আনন্দে গায়ত্রী দেবীকে এ সংবাদ জানাইল। সে ভাবিয়াছিল, শশাঙ্কবাবুর সদাশয়তার জন্য গায়ত্রী দেবী খুবই আনন্দিত হইবেন।

সৎপথ রুদ্ধ হইলে প্রলোভনীয় জিনিষ মানুষকে অসৎ পথে চালিত করে। গায়ত্রী বুঝিল, তাহাকে সহজে আয়ত্ত করিবার জন্য শশাঙ্কবাবু প্রকারান্তরে এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন।…

প্রায় মাসাধিক কাল এইভাবে কাটিয়া গেল। গায়ত্রী এখন

শরৎচন্দ্র ও শশাঙ্কবাবু উভয়েরই ধ্যানের বস্তু হইয়াছে, উভয়েই মনে মনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঈর্ষানলে পুড়িয়া মরিতেছেন। মধ্যে রক্ষক স্বরূপ ফ্রেণ্ড না থাকিলে কি যে অঘটন ঘটিত, তাহা কে বলিতে পারে?

বর্ষার লতার মত অপ্রতিহত গতিতে শরৎচন্দ্রের লালসা বাড়িয়া উঠিল, তিনি গায়ত্রীর হৃদয় আকর্ষণ করিবার জন্ম গোপনে নাপিতানীকে হাত করিলেন। নাপিতানী একদিন কথায় কথায় শরৎ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া গায়ত্রীকে বলিল—এমন নিরীহ পরোপকারী লোক পৃথিবীতে আর ছুটি নেই, মা। সারাদিন বই আর লেখা নিয়েই থাকেন। বাইরের জগতের দিকে বাবুর মোটেই লক্ষ্য নেই, শুধু কি জানি তোমাকে দেখে পাগলের মত হ'য়ে গেছেন। প্রায়ই তোমার কথা ভাবেন, বলেন তুমি আর কতদিন এমন অবস্থায় একলা থাকবে। আজ কাল বিধবা বিবাহ ত মোটেই দোষের নয়।

বিরক্তিতে গায়ত্রীর সর্বাঙ্গ জ্বালা করিতে লাগিল। সে কিছুতেই একথা বিশ্বাস করিতে পারিল না।

সুখে দুঃখে এইভাবে দিন কাটিতেছিল। অকস্মাৎ একদিন ফ্রেণ্ডের তলপেটে ব্যথা ধরায় সে অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়িল। অফিস প্রত্যাগত ঘর্মাক্ত কলেবর শরৎচন্দ্র বাসায় ফিরিবার পথে দেখিলেন, ফ্রেণ্ডের বাটিতে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে এবং গায়ত্রী বিষন্ন মুখে বসিয়া তাহাকে পাখার বাতাস করিতেছে? শরৎচন্দ্র আমাকে সংবাদ দেওয়ায় আমি ডাঃ নীলমণি দে কে সঙ্গে লইয়া আসিয়া দেখিলাম, ফ্রেণ্ড যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। আমাকে দেখিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

ডাক্তার দে ব্যারামটি 'এপেণ্ডিসাইটিস্' অনুমান করিয়া পরদিন প্রাতঃকালেই তাহার অপারেশনের জন্ম হাঁসপাতালে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন। আমি অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিলাম।

ফ্রেণ্ডের ওখান হইতে আসিয়া ভাবিলাম, গায়ত্রী অসহায়া অবস্থায় না জানি কত দুঃখ ভোগ করিবে।...

পরদিন সকালে ফ্রেণ্ডের বাটিতে ঠিক সিঁড়ির সম্মুখেই শশাঙ্কবাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, আজ তাঁহার সাজ-সজ্জার একটু বিশেষ পারিপাট্য দেখিলাম। অমাবস্যানিশীথে সম্মুখে প্রেতমূর্তি দেখিলে পথিক যেমন চমকিয়া উঠে, শশাঙ্কবাবু আমাকে দেখিয়া সেরূপ চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—আপনি এখানে ?

রেঙ্গুনে 'বেঙ্গল সোসিয়েল ক্লাব' প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে স্থাপিত। এখানে সাধারণ পাঠাগার, লাইব্রেরী, ক্রীড়া-কৌতুক, গীত-বাদ্যাদির আয়োজন ও অতিথি অভ্যাগত আসিলে থাকিবার ব্যবস্থা আছে। রেঙ্গুন সহরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ বাঙ্গালী এই ক্লাবের সভ্য। কোন নবাগত ব্যক্তির ক্লাব গৃহে থাকিতে হইলে, ক্লাবের নিয়মানুযায়ী সেক্রেটারীর অনুমতি লইতে হয়। আমি এই ক্লাবের সেক্রেটারী ছিলাম বলিয়া শশাঙ্কবাবু প্রথমে রেঙ্গুনে আসিয়া কিছুদিন ক্লাবে থাকিবার জন্য আমার অনুমতি লইতে আমার বাটিতে আসিয়াছিলেন। সুতরাং এই কদর্য পল্লীতে বিশেষতঃ, গায়ত্রীদের বাটিতে আমাকে দেখিয়া তাঁহার আশ্চর্য হওয়া বিচিত্র নহে।

আমি কিরূপভাবে এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট জানিয়া শশাঙ্কবাবু আমাকে বলিলেন—তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত কর্মচারীর কঠিন পীড়ায় সবিশেষ দুঃখিত এবং রোগীর ইচ্ছানুযায়ী তাঁহাকে অন্য একজন কর্মচারীর সহিত কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে মনস্থ করিয়াছেন। সমস্ত ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করিবেন, সেজন্য আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না। তাঁহার ব্যবস্থানুযায়ী পরদিনের জাহাজেই ফ্রেণ্ডকে কলিকাতায় পাঠান হইল। শশাঙ্কবাবু অদূর ভবিষ্যতের বিরাট স্বপ্ন দেখিয়া উৎসাহিত হইলেন, এবং একদিনেই গায়ত্রীর পরম হিতৈষী

বন্ধু সাজিয়া তাহাকে ঢাকার নারী আশ্রমে পাঠাইবার অছিলায় উপস্থিত তাঁহার টম্‌সন্ ষ্ট্রীটের নূতন বাসায় স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাহাতে ঘোর আপত্তি করায় তিনি একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

পূতচরিতা, সতীসাধ্বী গায়ত্রী নয়নজলে ভাসিতে ভাসিতে দুঃখ-ভরা ভাঙ্গা প্রাণে ফ্রেণ্ডকে বিদায় দিবার সময় তাহার ধৈর্য-চ্যুতি ঘটিল। তাহার এই বন্ধুহীন নিঃসঙ্গতা আমাকে কম আঘাত দিল না।

এখন আর গায়ত্রীর সহিত দেখা করিতে বা কথা কহিতে আমার কোন দুর্বলতা বা লজ্জা আসিল না, আমি তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম—মা, তুমি ভক্তিমতী, মায়ের চরণাশ্রিতা, মা-ই তোমাকে রক্ষা ক'রবেন; আমি একটু পরেই কুঞ্জবাবুর গাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি, গাড়ীর সঙ্গে তাঁর বাড়ীর কেউ এ'লেই তুমি চলে এস, উপস্থিত দিদির কাছেই থাকবে।

ফ্রেণ্ডই ছিল গায়ত্রীর একমাত্র সম্বল ও রক্ষক। ফ্রেণ্ড চলিয়া যাইবার পর গায়ত্রী বিরাট শূন্যতা ও অসহায়তার অবসাদ অনুভব করিয়া অন্যমনস্কভাবে অনেক কথাই ভাবিতে ছিল। তাহার মধ্যে কুঞ্জবাবুর বাড়ীর চিন্তাই বেশী। এই সময় হঠাৎ কোথা হইতে বেগে ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইলেন শরৎচন্দ্র। প্রবল ভাবের রুদ্ধ আবেগে উদ্‌ভ্রান্ত সেই মূর্তির দিকে চাহিয়া এবং তাঁহার কল্পনাতীত আবির্ভাবে মহাবিস্ময়ে গায়ত্রী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া পার্শ্বের ঘরে পলাইয়া গেল এবং দেখিল তাহার কল্পিত পবিত্র সাধক মূর্তির পরিবর্তে একটি লালসালিপ্ত কামনার জীবন্ত চিত্র। শরৎচন্দ্র গায়ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—এ সময়ে আমাকে দেখে আপনি ভারী অবাক হয়ে গেছেন না? আমি কিন্তু আপনাকে রক্ষা করবার জন্যই ছুটে এসেছি। শয়তানের প্রতীক শশাঙ্কবাবু আপনাকে এখনই তাঁর

বাসায় নিয়ে যাবার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র ক'রে অনেক লোকজন নিয়ে আসছেন, আপনি কিছুতেই যাবেন না। আমি প্রতিবেশীদের সাহায্যে তাঁর কার্যে প্রাণপণে বাধা দোব, খুব সম্ভব একটা ভীষণ মারপিট ও পুলিশ কেস হবে।

অবগুণ্ঠনাবৃতা গায়ত্রী এই কথা শুনিয়া ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র উৎসাহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি এখন যাবেন কোথায়?

—মা-র ইচ্ছা যা হবে, উপস্থিত ত পথে দাঁড়িয়েছি!

—পথে দাঁড়িয়েছেন বটে, কিন্তু ঘর তৈরী করে নিতে কতক্ষণ?

—সে ঘর মা-ই ঠিক ক'রে দেবেন, আপনাকে চিন্তা করতে হবে না।

খরবাহিনী নদীর দ্রুত স্রোতে ক্ষুদ্র উপলখণ্ড যেমন ভাসিয়া যায়, গায়ত্রীর প্রণয়াশারূপ প্রবল প্রবাহে শরৎচন্দ্রের বিবেক, মনুষ্যত্ব ও চক্ষুলজ্জা সব ভাসিয়া গেল। তিনি বলিলেন—আমার জীবনের মাঝখানে যে আপনার আসন পাতা হ'য়ে গিয়েছে, গায়ত্রী দেবী। আমাকে একেবারে ঠেলে ফেলে দিয়ে কি আপনি চলে যেতে পারবেন?

...শরৎচন্দ্রের কথায় গায়ত্রী শিহরিয়া উঠিল। উদাসী সাধকের মনে যে পাপ থাকিতে পারে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। গায়ত্রী কাঁদিয়া ফেলিল, তাহার মনে হইতে লাগিল সমস্ত বিশ্ব যেন হঠাৎ কোন পৈশাচিক মন্ত্রে ভরিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন কবিতে বসিয়াছে, বিরাট অন্ধকারে সে ধরিবার ছুঁইবার কিছুই পাইল না।...

ইহার অল্পক্ষণ পরেই একজন আধাবয়সী স্ত্রীলোক একখানি থালায় করিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন লইয়া গায়ত্রীর বাটিতে উপস্থিত হইল। গায়ত্রী প্রশ্ন করিল—তুমি কে গা?

স্ত্রীলোকটি মুচকি হাসিয়া জানাইল—আপনাদের মনিব শশাঙ্কবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন। কেন এত কষ্টে থাকা বাপু, এমন রূপ যার।

কথার মাঝখানেই গায়ত্রী উত্তেজিত হইয়া দৃঢ়ভাবে বলিয়া উঠিল—না। এখুনি নিয়ে যাও সব।

মেয়েমানুষটি একটু অবাক হইয়া বলিল—নিয়ে যাব কি গো? আপনার জলখাবার জন্যেই ত তিনি পাঠিয়ে দিলেন, গাড়ী আসছে, এখুনি ত আমাদের বাড়ীতে যেতে হ'বে?

তখনই গাড়ী আসিবে শুনিয়া গায়ত্রী ভয়ে কাঠ হইয়া গেল। অন্তরে ভীষণ ঝড় বহিতে লাগিল ও তাহার হৃদপিণ্ড ধড়্‌ফড়্‌ করিতে লাগিল; বড়ই উৎকণ্ঠা ও দুঃখে সে মনে মনে ভবভয়হারিণী মাকে স্মরণ করিতে লাগিল।

প্রণয়মুগ্ধ শরৎচন্দ্র ও পরদারলোভী শশাঙ্কবাবুর মধ্যে যাহাতে এই ঘটনা লইয়া রক্তারক্তি না হয়, তাহা নিবারণ করিবার জন্য মুহূর্তকাল বিলম্ব না করিয়া আমি গায়ত্রীকে স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্ত করিলাম।

অসীম আশা হৃদয়ে লইয়া শরৎচন্দ্র যে প্রেমের তরী ভাসাইয়া ছিলেন, তাহা কাল বৈশাখীর ঝড়ে পড়িয়া উল্টাইয়া যাইতে পারে এ কথা তাঁহার মনে কোনদিন উদয় হয় নাই। কোন্ দুরাকাঙ্ক্ষার বেগে বুদ্ধির বিপদসঙ্কুল পথে তিনি চলিয়াছেন, সেই দিকে তাঁহার খেয়াল ছিল না। যে গায়ত্রীকে না পাইলে তাঁহার জীবন মরুময় হইয়া উঠিবে, যে গায়ত্রী-লাভের লুব্ধ বাসনা তাঁহার মনকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করিতেছে, সেই গায়ত্রীকে শশাঙ্কবাবু অবৈধ উপায়ে হস্তগত করিবে, এই চিন্তা তাঁহার অসহ্য হইল। সেইজন্য আজ শরৎচন্দ্র অফিসে যান নাই। প্রতিবেশী মহলে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাহাদের অনেকেই তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে।

শরৎচন্দ্র ফ্রেণ্ডের বাড়ী হইতে তাঁহার বিছানা পত্র আনিবার সময় নাপিতানীর হাতে গায়ত্রীর জন্য একখানি চিঠি দিয়া আসিলেন।

এ সময়ে শরৎচন্দ্র তাঁহার জীবনের সদসৎ, ভালমন্দ কোন জিনিষই আমার নিকট অব্যক্ত রাখিতেন না, কিন্তু মনের মধ্যে পাপ ছিল বলিয়া এই প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারটি গোপন করিয়াছিলেন; এমন কি আজ ক্রেণ্ডের বিদায় মুহূর্তেও গায়ত্রী নিঃসঙ্গ অবস্থায় কোথায় থাকিবে, এ কথাও আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই।

গায়ত্রীর আশ্রয় নাই বা তাহার পথে বসাও অভ্যাস নাই, সুতরাং নিরাশ্রয়া গায়ত্রী নিশ্চয়ই তাঁহার বাটিতে আসিবেন, এই অলীক কল্পনার বশবর্তী হইয়া শশাঙ্কবাবু যথাসময়ে একখানি এক্কা গাড়ী, ঝি ও দরওয়ান পাঠাইয়াছেন। অধিকন্তু শরৎচন্দ্র পাছে বাধা দেন, এই আশঙ্কায় দুইজন জেরবাদী (বর্মা ও মুসলমান মিশ্রিত—দো আঁশলা) গুণ্ডা তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছে।

আমি কুঞ্জবাবুর বাড়ীতে যখন পৌঁছিলাম, তখন তাঁহার অফিস যাইবার সময়, তিনি খাইতেছিলেন ও দিদি তাঁহার সহিত কথাবার্তা কহিতেছিলেন। এই অসময়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বলায় দিদি বলিলেন—আহা! বেচারীর কি বিপদ, তুমি এখনই এঁর অফিসের ফেরৎ গাড়ীতে তাকে আমার এখানে নিয়ে এস।

কুঞ্জবাবু বলিলেন—ও পাড়ার অত গণ্ডগোলের মধ্যে তুমি একলা যেও না, সঙ্গে বাদলু ও মসিদীর একজন লোক নিয়ে যাও।

বাদলু ওরফে চুনীলাল চট্টোপাধ্যায় কুঞ্জবাবুর শ্যালক। এ বাড়ীতেই থাকে, অবিবাহিত চরিত্রবান যুবক, বর্মা রেলওয়ে অফিসে চাকরী করে। সে দিদির আপন ভাই ও আমি স্নেহ সম্পর্কীয় ভাই হইলেও এ বাড়ীতে আমরা উভয়ে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় বহুকাল কাটাইয়াছি।

বাদলু ভায়া ও আমি কুঞ্জবাবুর সহিত তাঁহার অফিসে গিয়া

মসিদী সাহেবের নামে একখানি চিঠি লইয়া তাঁহার চিকে-মংটলে ষ্ট্রীটের বাটিতে পৌছিবামাত্র তিনি সসম্ভ্রমে আমাদের সেলাম করিয়া একজন বলিষ্ঠ পাঠান পালোয়ানকে আমাদের সঙ্গে দিলেন।

রেঙ্গুন সহরে মসিদী সাহেবের নিকট সেলাম পাওয়া একটি সম্মানের কথা, এটি কুঞ্জবাবুর খাতিরেই আমরা পাইলাম। মসিদী সাহেব কুঞ্জবাবুর একজন বড় মক্কেল, ইনি পেশওয়ারী মুসলমান। প্রসিদ্ধ সওদাগর; ঘর-বাড়ী, বিষয় সম্পত্তি, খ্যাতি-প্রতিপত্তি সমস্তই রাজোচিত। দুঃখের বিষয় তাঁহার একটি বিষয়ে দুর্নাম আছে; জনরব যে, গভর্ণমেণ্টের নিষিদ্ধ আবগারী বিভাগ গোপনে তাঁহারই হস্তগত। সহরে যতগুলি মেওয়া-ফলের দোকান আছে, ইনি সবগুলিরই মালিক। ইঁহার কর্মচারিবৃন্দের মধ্যে অনেক পেশওয়ারী গুণ্ডা নিযুক্ত থাকায় রেঙ্গুন সহরের দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রভৃতি সকল দুঃসাহসিক কার্যের সহিতই ইঁহার নাম সংশ্লিষ্ট। এক কথায় মসিদী সাহেবের নামে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খাইত।

মসিদী সাহেবের লোক সঙ্গে লইয়া আমরা শরৎ-পল্লীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, শশাঙ্কবাবু একখানি গাড়ীতে বসিয়া আছেন ও তাহার পশ্চাতে আর একখানি খালি গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে, কিছুদূরে শরৎচন্দ্র একটি গলি পথের আড়ালে গায়ত্রীর ঘরের দিকে চাহিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। উভয় পক্ষের উত্তেজিত বহুলোক সমবেত হইয়া কুরুক্ষেত্রের সূচনা করিতেছিল। এমন সময় কুঞ্জবাবুর বর্মা-পনি সংযুক্ত জুড়ি গাড়ীতে লাঠি হস্তে পালোয়ান সহ আমাদের নামিতে দেখিয়া ভয়ে সকলে একে একে সরিয়া পড়িল।

আমি ও বাদলু ভায়া উপরে উঠিয়া দেখিলাম, শশাঙ্কবাবুর ঝি গায়ত্রীর নিকট বসিয়া আছে। নাপিতানী আমাদের দেখিয়া

বলিয়া উঠিল—ও মা, বাঁড়ুজ্যে সাহেবের গাড়ীতে গিন্নীমার দুই ভাই তোমায় নিতে এসেছেন।—আমাদের দেখিয়া গায়ত্রী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল এবং অবিলম্বে আমাদের গাড়ীতে আসিয়া উঠিল।

দূরে শরৎচন্দ্র হতভম্বের মত আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়ইয়া ছিলেন, দারুণ লজ্জায় আমাদের সম্মুখীন হইতে পারিলেন না।

অকূলে কূল পাইয়া গায়ত্রী চোখের জলে বুক ভাসাইয়া দিল, বহুদিনের এই কদর্য পল্লী হইতে বাহির হইয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল এবং কুঞ্জবাবুর বাড়ীতে পৌছিয়াই দিদির পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

প্রবল অশ্রুবেগ দমন করিয়া কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর গায়ত্রী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তাহার অবরুদ্ধ মনোবেদনার কথা সমস্ত একে একে দিদিকে জানাইল।

দিদি একদিন কথা প্রসঙ্গে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—শরৎবাবু লোকটি কে, গিরীন্দ্র?

আমি বলিলাম—উৎসবের সময় আমার বাড়ীতে যিনি গান করেন।

—তোমাদের শরৎবাবু গায়ত্রীকে বিয়ে করতে চান, বলেন, বিধবা বিবাহে দোষ নেই?

—উনি মাথাপাগলা, একটু ছিট আছে।

এই ঘটনার পর শরৎচন্দ্র বহুদিন পর্যন্ত আমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন নাই। ইহা ক্রোধের বা ঘৃণার নীরবতা নয়; গভীর লজ্জায় মৌন-ব্রত!…

কুঞ্জবাবু নিজের গরজেই গায়ত্রীর মেসোমহাশয়কে তাহার প্রবাস ক্লেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও তীব্র বৈরাগ্যের কথা লিখিয়া জনাইলেন এবং তিনি অনাথা গায়ত্রীকে তাঁহার সংসারে একটু স্থান দিতে

পারেন কিনা জানিতে চাওয়ায়, উত্তরে গায়ত্রীর মেসোমহাশয় লক্ষ্নৌ হইতে লিখিলেন :—

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

পূজনীয় কুঞ্জবাবু,

আপনার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল, সেজন্য ক্ষমা করিবেন। সম্প্রতি আমার স্ত্রী বিয়োগ হওয়ার দরুণ বড়ই মনঃকষ্টে আছি। আমার স্ত্রী গায়ত্রীকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। গায়ত্রী আমার স্ত্রীর প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ছিল, তাহার হঠাৎ দেশ-ত্যাগের সংবাদে তিনি মরমে মরিয়াছিলেন। এই লক্ষ্মীস্বরূপিনী কন্যাটি ধর্মজীবন লাভ করিয়াছে ও আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির আশ্রয়ে আছে শুনিয়া তিনি মৃত্যু সময়ে অনেক সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন।— আমি বেশ বুঝিয়াছি গায়ত্রী নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র। আপনি রেঙ্গুনের জননেতা ও অনেকের আশ্রয় দাতা। দয়া করিয়া গায়ত্রীকে পত্র পাঠ লক্ষ্নৌয়ে পাঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিলে চিরবাধিত হইব। আপনার পত্র পাইলে জাহাজ ভাড়া ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ যাহা খরচ হইয়াছে সমস্ত টাকা পাঠাইয়া দিব। নিবেদন ইতি।—

প্রণতঃ শ্রীভবদেব ভট্টাচার্য

এই পত্র মধ্যে তিনি গায়ত্রীকে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন— মা গায়ত্রী, তোমায় হারিয়ে মন অত্যন্ত খারাপ হ'য়েছিল, এখন সে কষ্ট দূর হ'ল। তুমি যে ব্যথা পেয়েছ, আমরা কর্তব্য ও সমাজকে রক্ষা ক'রতে গিয়ে তোমার অভাবে তাহার চেয়ে একটুও কম ব্যথা পাইনি। আমরা পাহাড়ের মত শক্ত হ'য়ে তোমার প্রতি যে মমতা-হীন নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি, তার জন্য বিশেষ অনুতপ্ত। তুমি শীঘ্র চলে এস। তোমার মাসীমা মৃত্যুকালে তাঁহার দেবসেবার ভার তোমার উপর দিয়ে গেছেন, আর তোমার তীর্থ ভ্রমণ, পূজা অর্চনা

ও অতিথি সৎকারের জন্য দশ হাজার টাকা রেখে গিয়েছেন। শোকের সময় গিরীনবাবুর পত্রের জবাব দেওয়া হয়নি সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। তিনি তোমায় রক্ষা ক'রেছেন, আমরা তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলাম। তাঁকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিও ও তুমি আমার স্নেহাশীর্বাদ নিও। ইতি—তোমার মেসোমহাশয়।

এই পত্র পাইয়া গায়ত্রী যেন হাতে স্বর্গ পাইল।

কয়েক দিন পরে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু মিঃ এ, সি, মুখার্জি, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, বর্মা গবর্ণমেণ্টের চাকরী হইতে বদলী হইয়া ভারত সরকারের অধীনে লক্ষ্ণৌর সন্নিকটস্থ পিলিভিট নামক স্থানে বাহাল হন। তিনি সপরিবারে যাইতেছেন দেখিয়া আমরা গায়ত্রীকে তাঁহার সহিত একই জাহাজে কলিকাতা পাঠাইয়া দিলাম।

...বহুদিন পরে শরৎচন্দ্র একদিন আমার বাটিতে আসিয়া মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিলেন—ভাই, লুকোচুরি কেবল মনকে বিক্ষিপ্ত করে ও অশান্তি বাড়ায়, তাই তোমার কাছে এলাম।

—বেশ করেছ শরৎদা! আমি প্রায়ই তোমার কথা ভাবি, কোথায় ডুব দিয়েছিলে এতদিন?

—পৃথিবীতে এতবড় বিড়ম্বনা আমার ভাগ্যে ঘটেনি, ভাই। কল্পনা কোনদিন বাস্তব হয়ে দেখা দেয় না।...ভুক্তভোগী ভিন্ন আমার অবস্থা কেউ বুঝতে পারবে না। অপরিণত বয়সে নিজেকে বিসর্জন দেবার আকাঙ্ক্ষা অল্প বিস্তর সকল মানুষেরই থাকে! অসংযমী মনের উপর প্রভুত্ব করা বড় শক্ত। এমন কত পুরুষের মন কত নারীর মনকে গোপনে চেয়ে এসেছে তার সংখ্যা করা যায় না।...তোমার দিদিকে আমার দুর্বলতা মার্জনা করতে ব'লো, কুঞ্জবাবুর কানে যেন এ সব কথা না উঠে।"

রজকিনী

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে তাঁর বাল্যবন্ধু বিভূতিভূষণ ভট্টকে একটি দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রে তিনি রেঙ্গুনে আঠার মাস ব্যাপী এক রজক কন্যার সহিত তাঁর দাম্পত্য প্রেম চর্চার এক চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণনা করেন। চিঠির মধ্যেকার সেই কাহিনীটি এই :—

"পরম কল্যাণীয় পুঁটুভায়া,

...আমার ইতিহাস একটু শুনিবে? মধ্যে এই রেঙ্গুনে দাম্পত্য প্রেম চর্চা করিতে গিয়া হঠাৎ দেখিলাম, পুরা গৃহী হইয়া পড়িয়াছি। দেড় বৎসরের মধ্যে সেই অসীম অগাধ প্রণয়ের তলা দেখি নাই। একদিন মধুর কলহ (!) বাধিয়া গেল এবং মান ভঞ্জনের পূর্বেই দেখিলাম, গৃহিণী আমার অভিমান ভরে আর একজন সুপাত্রে বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন। কাজেই আমি আমার পোঁটলা-পুঁটলি ঘাড়ে করিয়া এই ৩৬ নম্বর গলির চার তলার একটি ঘর ভাড়া লইয়া বিছানা পাতিয়া চিৎ হইয়া চুরুট টানিতে লাগিলাম।

এটা যে কি হইয়া গেল, আজো তাহার মীমাংসা করিতে পারি নাই। বধু আমার ব্রহ্মদেশিণী ছিলেন না, খাঁটি স্বদেশী। যখন শুনিলাম, তিনি রজক কন্যা, তখন কান মলিয়া, এক হাত নাকখত্ দিয়া ঐরাবতীতে স্নান করিয়া আসিলাম ও পরদিনেই Medical Certificate দিয়া Passage বুক করিয়া বিরহ জ্বালা শান্ত করিতে হংকং চলিয়া গেলাম। ফিরতি পথে কলিকাতায় গিয়াছিলাম মাত্র। শুনিয়াছি চণ্ডীদাস নাকি ঐ রকম কি একটা করিয়া মাথুর লিখিয়াছিলেন,

আমিও স্থির করিয়াছি, বহু পূর্বে 'চরিত্রহীন' বলিয়া যেটা স্বরু করিয়াছিলাম, এইবার সেটা শেষ করিব।

দেশে গিয়াও সুখ পাই নাই। একবার ওলাউঠা হইল, কতদিন হাঁসপাতালে Operation হইয়া পড়িয়া রহিলাম। আর সব চেয়ে জ্বালাতন করিয়াছিল, কন্যাদায়-গ্রস্ত পিতার দল। গায়ের চামড়া খাইয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল। আমার দুঃখের দিনে তাঁহারা যে কোথায় ছিলেন জানি না। কিন্তু আজ নিশ্চিন্ত হইয়া বাকি দিন ক'টা কাটাইয়া দিবার যেই সময় আসিয়াছে, অমনি দয়া করিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁহারা কোন অজ্ঞাত স্থান হইতে যে বাহির হইতেছেন, নির্ণয় করিবার ক্ষমতা আমার ত নাই!

আমি গৃহ, গৃহিণী, প্রণয় ও বিরহ এই আঠার মাসের মধ্যে এমনি পুরাদমে ভোগ করিয়া লইয়াছি যে, তাহা হজম করিতে অন্ততঃ আঠার বৎসর লাগিবে। ইহার পরেও যদি বাঁচিয়া থাকি, ওদিকে চাহিব—এখন নয়।"

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই চিঠির মধ্যেকার রজক কন্যার সহিত শরৎচন্দ্রের প্রণয় চর্চার কাহিনীটি সত্য কিনা? না বন্ধুর কাছে পরিহাস করে বা মিথ্যা করে লেখা?

এ সম্পর্কে আমার মনে হয় এই:—

চিঠির কথা যে মিথ্যা, সে সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলা যায় না। সত্য হলেও হতে পারে। কেন না আগাগোড়া সমস্ত চিঠিখানি পড়লে দেখা যায় যে, যেভাবে চিঠিটা লেখা তাতে হাল্কামি বা পরিহাস করেছেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধু সতীশচন্দ্র দাসের "শরৎ-প্রতিভা" গ্রন্থেও দেখা যাচ্ছে, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের কিছুদিন আগে শরৎচন্দ্র একবার কলকাতায় এসেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের এই চিঠিতে রেঙ্গুনের ৩৬ নং গলির চার্ তলার ঘর ভাড়া করার উল্লেখ আছে। শরৎচন্দ্র এক সময় রেঙ্গুনের ৩৬নং গলিতে ছিলেন এবং এক সময় চার তলার একটি ঘরেও ছিলেন, এ কথাও সত্য। রেঙ্গুন থেকে লেখা শরৎচন্দ্রের অনেক চিঠিতে ৩৬ নং গলির ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছে। তবে এই চিঠিগুলি সবই ১৯১৪ সালের পরের। শরৎচন্দ্র এই ৩৬ নং গলির ক'তলার ঘরে ছিলেন জানা যায় না, কিন্তু এক সময় যে বাড়ীর চারতলার ঘরে তিনি ছিলেন, সে বাড়ীটি ছিল বোটাটং ষ্ট্রীটে। এ কথার উল্লেখ করে সতীশচন্দ্র দাস তাঁর "শরৎ-প্রতিভা" গ্রন্থে লিখেছেন—বোটাটং ষ্ট্রীটে আমাদের মেস। আমরা থাকতাম তিন তলায়, শরৎদা থাকতেন চারতলায়।

বোটাটং অঞ্চলটা রেঙ্গুন শহর থেকে মাইল দুই দূরে অবস্থিত।

যাই হোক্, শরৎচন্দ্রের চিঠির কাহিনী সত্য হলেও হতে পারে বলে মনে হয়।

এই চিঠির কাহিনীটি আবার সত্য নাও হতে পারে। এটি সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য করে বানিয়ে বলা একটি মিথ্যা কাহিনীও হতে পারে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁরা মিশেছেন, তাঁরাই জানেন যে, মিথ্যা করে বানিয়ে গল্প রচনা করতে তিনি কিরূপ ওস্তাদ ছিলেন, আর এমনি ভাবে তিনি বলতেন যে, কারও সাধ্য ছিল না, তাকে অবিশ্বাস করে।

আর একটি কথা, শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের জীবন নিয়ে যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা শরৎচন্দ্রের জীবনে যে এরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল, একথা বলেন নি। গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর "ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র" গ্রন্থে অনেক কথাই লিখেছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের জীবনে এই রজকিনী প্রেমের কথা কোথাও উল্লেখ করেন নি। গিরীনবাবু তাঁর বইয়ে বলেছেন যে, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে যাওয়ার সময় থেকে চলে আসার সময় পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১৪ বৎসর কাল তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক থাকায় তিনি

শরৎচন্দ্রের জীবনের অনেক ছোট বড় ঘটনা ও চিত্তাকর্ষক কাহিনী জানতেন। শরৎচন্দ্রের জীবনে ১৮ মাস ব্যাপী দাম্পত্য প্রেম চর্চার এমন একটি ব্যাপার যদি ঘট্‌ত, তাহলে গিরীনবাবু সে কথা তাঁর বইয়ে উল্লেখ করতেন বলেই মনে হয়।

কবি চণ্ডীদাসের রজকিনী প্রেম বিশ্ব-বিখ্যাত। শরৎচন্দ্রের পক্ষে, নিজেকেও এইরূপ একটি রজকিনী প্রেমের সঙ্গে জড়িত করে, বানিয়ে বন্ধুর কাছে চিঠি লেখা, এমন কিছু বিচিত্র নয়।

এখন কথা উঠতে পারে যে, যদি মিথ্যাই হয়, তবে নিজেকে এইভাবে খেলো ক'রে এ সব বলার অর্থই বা কি ?

এর উত্তরে এই বলা যেতে পারে :—বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে মিথ্যা করে বানিয়ে পরিহাস করতে শরৎচন্দ্র খুব পছন্দ করতেন। তা ছাড়া তাঁর আর একটা স্বভাব ছিল এই যে, তিনি যা নন্, অনেক সময় লোকের কাছে নিজেকে তাই বলে প্রচার করতেন। যেমন তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু ও ভগবদ্-বিশ্বাসী হলেও লোকের কাছে মুখে এবং লিখে সর্বদাই নিজেকে ঘোরতর নাস্তিক বলে প্রচার করতেন। যেমন :—

শরৎচন্দ্র কাশী থেকে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে একবার এক পত্রে লেখেন—"একটি বড় মজার খবর আছে। এখানে ভৃগু সংহিতার এক নামজাদা পণ্ডিতজী আছেন। তিনি তো আমার কুষ্ঠি গুণে নিজেও হাঁ করে রয়ে গেলেন, আমিও হাঁ করে রয়ে গেলুম। তিনি বারম্বার বলতে লাগলেন, এ কোন্ মহাযোগীর না হয় রাজতুল্য কোন ব্যক্তির কুণ্ডলী। ধর্মস্থানে বৃহস্পতির এতবড় পরিপূর্ণ সংস্থান তিনি নাকি আর দেখেন নি। আচ্ছা ভায়া, এ যদি সত্য হয় তো আমার মত নাস্তিকের ভাগ্যে এ কি বিড়ম্বনা, একি কঠোর পরিহাস বলুন তো ?"

শরৎচন্দ্র সামতাবেড় থেকে দিলীপকুমার রায়কে একবার লেখেন—"মণ্টু, একটি কথা বোধ করি পূর্বেও আমার কাছে শুনে থাকবে

আমাদের বংশের একটি ইতিহাস আছে। এই বংশে আমার মেজভাই (প্রভাস) ৺স্বামী বেদানন্দকে নিয়ে অখণ্ড ধারায় ৮ম পুরুষ সন্ন্যাসী হওয়া চললো—কেবল আমিই হোলাম একেবারে ঘোরতর নাস্তিক। Heredity আমার রক্তে একেবারে উজান টানে সুর ধরলে।"

কাশীতে সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শরৎচন্দ্র একবার নিজেকে নাস্তিক বলে পরিচয় দিতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কেদারবাবুর তখন যে কথা হয়েছিল, কেদারবাবু "শরৎ-কথা" নামক প্রবন্ধে নিজেই সে সম্পর্কে লিখেছেন—

"তখন আমরা দশাশ্বমেধের কালীবাড়ীর সামনে এসে পড়েছি।

আমি 'মা'কে প্রণাম করলুম। দেখি তিনি তফাতে সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

বললেন—আমাকে নাস্তিক বলে অনেকেই জানেন, আপনিও জানেন বোধ হয়।

বল্‌লুম—অপরাধী করবেন না। আপনার বইয়ের মধ্য দিয়েই আপনার সঙ্গে পরিচয়। তাতে যে ছাপা হয়ে গিয়েছে, আপনি পরম আস্তিক।

—কে বললে? কোথায়? ভুল কথা।

—যা নিয়ে অনেক কথা শুনতে পাই, সেই চরিত্রহীনেই রয়েছে। দিবাকর গৃহ-দেবতা নারায়ণের ভোগ না দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল। তার মন কিন্তু সেই অপরাধের বেদনা এড়াতে পারেনি। ফেরবার পথে গঙ্গাতীরে গিয়ে অপরাধের জন্য সাশ্রু ক্ষমা প্রার্থনা না করে বাড়ী ফিরতে পারে নি। এই সামান্য ঘটনাটা নাস্তিক বাদ দিতেন। বিশেষ ক্ষতিও হত না। আপনি পারেন নি।…

—যান যান্, বেলা হয়েছে, নমস্কার।"

কেদারবাবু ঐ প্রবন্ধেই আরোও বলেছেন—

"তিনি দেশবন্ধুর সহিত দিল্লী যান। দিল্লী হ'তে ফেরবার পথে বৃন্দাবন না হয়ে ফেরেন নি। তাঁর সঙ্গীদের অন্যতম ছিলেন আমার জনৈক বন্ধু। তাঁর কাছে শুনেছি, আমাদের শরৎচন্দ্রকে গোবিন্দজীর মন্দিরে সাশ্রুনেত্রে গড়াগড়ি দিতে দেখে সকলেরি নয়ন সিক্ত হয়েছিল। অতি বড় নাস্তিকও সে দৃশ্য দেখলে আস্তিকত্ব পান।"

শরৎচন্দ্রের এক স্নেহভাজন বন্ধু হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ১৩৪৪ সালের মাসিক বসুমতীর মাঘ সংখ্যায় এক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন —"শরৎবাবু মৌখিক নাস্তিক ছিলেন, কিন্তু অন্তরে পরম দেবভক্ত ছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় তাঁহাকে যে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ দিয়াছিলেন, সেই রাধাকৃষ্ণের পূজা তিনি স্বয়ং প্রত্যহ করিতেন।"

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন, তাঁরা জানেন যে, শরৎচন্দ্র মৌখিক যেমন নাস্তিক ছিলেন, তেমনি তিনি অন্তরে অন্তরে রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত হয়েও, অনেক সময় মুখে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অভক্তির ভাব প্রকাশ করতেন।

মুখে একরূপ, অথচ অন্তরে অন্যরূপ শরৎচন্দ্রের এই যে স্বভাব, এই স্বভাবের বশবর্তী হয়ে বন্ধু বিভূতিভূষণ ভট্টর কাছে, এই চিঠিটি লেখাও শরৎচন্দ্রের পক্ষে বিচিত্র নয়।

পরের প্রণয়িনী

শরৎচন্দ্র যখন হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকতেন, তখন তাঁর বাসার অদূরবর্তী শিবতলা লেন নিবাসী প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক অক্ষয়কুমার সরকারের সহিত তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। অক্ষয়বাবু অত্যন্ত আদর্শবাদী ও নীতিবাগীশ লোক ছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর "শেষপ্রশ্ন" উপন্যাসে যে অধ্যাপক অক্ষয়বাবুর চিত্র এঁকেছেন, এই অক্ষয়বাবুই নাকি তার মূল। অবশ্য উপন্যাসে মূলের উপর তিনি প্রচুর কল্পনার তুলি বুলিয়েছেন।

যাই হোক্, শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরে থাকার সময় এই অক্ষয়বাবু অনেক সময় বন্ধু শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন, আবার শরৎচন্দ্রও অনেক সময় অক্ষয়বাবুর বাড়ীতেও আসতেন। উভয়ে মিলিত হলে, তখন তাঁদের মধ্যে যে সব আলোচনা হ'ত, অক্ষয়বাবু তাঁর একটি খাতায়, সে সব লিখে গেছেন।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ কালে এই অক্ষয়বাবুর সহিত আমার বিশেষ পরিচয় হয়েছিল। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে উপকরণ সংগ্রহ এবং আলোচনা করবার জন্য আমি অনেক দিন তাঁর বাড়ীতে গিয়েছি। অক্ষয়বাবু তাঁর "শরৎস্মৃতির" খাতাটি আমাকে দেখতে দিয়েছিলেন। আমি তা থেকে তাঁর লেখাগুলি নকল করে তাঁর খাতাটি তাঁকে ফিরিয়ে দিই।

ঐ খাতায় এক জায়গায় "শরৎবাবুর নারী চরিত্র" শিরোনামায় একটি লেখা আছে। লেখাটিতে তারিখ দেওয়া আছে ২-২-৩০। নারীচরিত্র সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের বহু অভিজ্ঞতার কথা যা তিনি

অক্ষয়বাবুর কাছে বলেছিলেন ; সে সব কথা অক্ষয়বাবু লিখে রেখেছেন। অক্ষয়বাবু লিখেছেন :—

"শরৎবাবুর উপন্যাসগুলিতে নারী চরিত্রের যে সব মনোরম বিশ্লেষণ আছে, তাহা সাহিত্য-রসিক মাত্রেই উপভোগ করিয়াছেন এবং সমালোচনার কঠিন কষ্টিপাথরেও নিয়ত পরীক্ষিত হইতেছে। কিন্তু আমি তাঁহার নিজের মুখ থেকে নারী চরিত্রের যে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ শুনিয়াছি, তাহাও কম অপূর্ব নয়।

'মোটেই অবলা নয়,' একদিন তিনি বলিলেন। নারীকে লোকে এবং কাব্য সাহিত্যে অবলা বলে কেন ? তাহারা অনেক বিষয়ে যাহা করিতে পারে, তাহা অনেক দুঃসাহসিক পুরুষের পক্ষেও অসম্ভব। শাস্ত্রকারেরা তাহাদের কাম প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ঠিক সত্য না হইতেও পারে, তবে ক্রোধে উত্তেজিত বা বাসনায় উন্মত্ত রমণীকে যাহা করিতে দেখিয়াছি, পুরুষকে কখনও সেরূপ করিতে দেখি নাই।"

এই ভাবে নারীচরিত্র সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের বলা অনেক কথাই অক্ষয়-বাবু তাঁর খাতায় লিখেছেন। অক্ষয়বাবু, শরৎচন্দ্রের শেষ কথাটি শুনে এইরূপ লিখে রেখেছেন :—

"আবার প্রণয়াস্পদের জন্য ইহাদের অকরণীয় কিছুই নাই। বর্মার কথা। একটি বাঙ্গালী মেয়ে এক বস্তীতে একজন রুগ্ন, কৃশ, কদাকার পুরুষকে লইয়া থাকিত। সে নানাভাবে······প্রণয় নিবেদন করিল।··· তাহার সঙ্গলিপ্সা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। কয়েক দিন একত্রে কাটাইবার পর সে অন্তর্ধান হইল। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পাগলের মত ঘুরিতে লাগিলাম। বাড়ীউলি একদিন সহানুভূতিতে বলিয়া ফেলিল, কাহার জন্য এমন ভাবে শরীর পাত করিতেছ ? সে কেমন তোমাকে ঠকাইয়া তাহার বন্ধুর জন্য টাকা রোজগার

করিতেছিল? এখন তাহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। তোমার উপর তাহার কখনো কিছু মাত্র দরদ ছিল না।

আশ্চার্য মেয়েটি কিন্তু বাস্তবিকই অত মন্দ নয়। শুধু প্রণয়াস্পদের হিতের জন্যই সে এমন হীন প্রতারণা করিয়াছিল।"

এখানে এই উদ্ধৃতিটির মধ্যে দু জায়গার "......" আছে। অক্ষয়বাবু ঐ দু জায়গায় শরৎচন্দ্রের নিজের কথা বলে ইচ্ছা করেই, যথাক্রমে "আমার কাছে" ও "আমার" এই কথা দুটি লেখেন নি।

যাই হোক্, অক্ষয়বাবুর এই লেখাটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে এক সময় একটি রুগ্ন, কৃশ ও কদাকার লোকের প্রণয়িনীর সহিত কিছুদিন একত্রে কাটিয়ে ছিলেন।

এই কাহিনীটির সত্যতা সম্বন্ধে অক্ষয়বাবুর কি মত, তা জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেছিলেন, সত্য হলেও হতে পারে। তবে কিন্তু মিথ্যা বানানো গল্প বলেই আমার মনে হয়।

এই কাহিনীটি সম্বন্ধে আমারও বক্তব্য এই যে, ঘটনাটি সত্য হলেও হতে পারে ; ঘটনাটি সত্য নয়, একথা জোর করে বলা যায় না। কেননা শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর "ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র" গ্রন্থে শরৎচন্দ্রকে "সমাজ-বিরোধী উচ্ছৃঙ্খল যুবক" বলে এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। নরেন্দ্র দেবও তাঁর "শরৎচন্দ্র" গ্রন্থে লিখেছেন—"কিছুদিন তিনি অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেন।"

তবে ঘটনাটি সত্য নয় বলেই, আমারও বিশেষ ভাবে মনে হয়।

শরৎচন্দ্র একবার এক পত্রে জীবন্ত সাহিত্য সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে দিলীপকুমার রায়কে লিখেছিলেন :—

"সব চেয়ে জ্যান্ত লেখা সেই, যা পড়লে মনে হবে গ্রন্থকার নিজের অন্তর থেকে সব কিছু ফুলের মত বাইরে ফুটিয়ে তুলেছে। দেখোনি বাঙ্গলা দেশে আমার সব বইগুলোর নায়ক-নায়িকাকেই ভাবে এই

বুঝি গ্রন্থকারের নিজের জীবন, নিজের কথা। তাই সজ্জন সমাজে আমি অপাংক্তেয়। কতই না জনশ্রুতি লোকের মুখে মুখে প্রচারিত।”

শরৎচন্দ্র যেমন জ্যান্ত লেখা লিখতেন, তেমনি গল্পও বলতেন জ্যান্ত গল্প। তাঁর মুখের গল্প শুনলে, সেই গল্পকে এতটুকুও অবিশ্বাস করবার উপায় থাকত না। আর তিনি তাঁর গল্পকে জীবন্ত করে তুলবার জন্য নিজের অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে, এমন কি ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলে চালিয়ে যেতেন। এতে তিনি শ্রোতার কাছে খেলো হবেন কি, ভাল হবেন, সে দিকে খেয়ালই রাখতেন না।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত ছিলেন, সকলেই জানেন যে, শরৎচন্দ্রের গল্প বলার কিরূপ অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁর কথা বলার ভঙ্গীতে এমন একটা যাদু ছিল যে, শ্রোতারা তাঁর কথা শুনলে অভিভূত হয়ে যেতেন।

এ সম্বন্ধে বিখ্যাত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন— “গল্প শুনিয়া আমি অভিভূত হইয়াছিলাম। শুধু গল্প নয়, গল্প বলিবার আশ্চর্য ভঙ্গিতেও। শরৎচন্দ্রের গল্প সকলে পড়িয়াছেন ও মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহার অনুপ্রেরণা আর এক ধরণের, তাহাতে ভাবের সংক্রামতা আরোও অব্যর্থ।”

আর শরৎচন্দ্রের পরিচিত সকলেই একথাও জানেন যে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বানিয়ে গল্প বলতে কিরূপ ওস্তাদ ছিলেন।

তাই মনে হয়, শরৎচন্দ্র অক্ষয়বাবুর কাছে নারী চরিত্র সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, নারী প্রণয়াস্পদের জন্য কিনা করতে পারে, এই গল্পটিকে জ্যান্ত গল্প করবার জন্য ঐভাবে নিজেকে জড়িয়েই হয়ত এই কাহিনীটি বিবৃত করেছিলেন।

শান্তি দেবী

শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর "ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র" গ্রন্থে লিখেছেন:—"শরৎচন্দ্র স্বজাতীয় কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যাকে সমাজের অবিচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্ব ইচ্ছায় বিবাহ করিয়া সুখী হইয়া ছিলেন।

বিবাহিত জীবনে শরৎচন্দ্র বেশীদিন সুখভোগ করিতে পারেন নাই। যৌবনে তিনি স্ত্রীর বড় অনুরক্ত ছিলেন। স্ত্রীকে ছাড়িয়া এক মুহূর্তও থাকিতে কষ্টবোধ করিতেন বলিয়া আমি তাঁহাকে মহাস্ত্রৈণ বলিয়া উপহাস করিতাম।

স্বপ্নবিলাসী শরৎচন্দ্রের প্রাণে ছিল, অপূর্ব প্রেমের ভাণ্ডার, তিনি তাঁহার সমস্ত খুলিয়া দান করিয়া ছিলেন তাঁহার স্ত্রী শান্তি দেবীকে, কিন্তু ভবিতব্যের বিধান অন্য প্রকার থাকায় ঘটনা অন্যরূপ হইল। বিধির বিপাকে বিবাহের দুই বৎসর পরেই তাঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী প্লেগ রোগাক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন। এ সময়ে তিনি অসহায় অবস্থায় রেঙ্গুন সেবক ও সৎকার সমিতির সাহায্য প্রার্থী হইয়াছিলেন।"

গিরীনবাবু এরপর তাঁর গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের প্রথম পক্ষের স্ত্রী শান্তি দেবীর মৃত্যু ও তাঁর শবদাহের যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন তা এইরূপ—

"শরৎচন্দ্রের সংসারে শুধু স্বামী আর স্ত্রী। নব-বিবাহিতা পত্নীকে হইয়া তিনি সুখেই জীরনযাত্রা নির্বাহ করিতে ছিলেন।

সহসা তাঁহার স্ত্রী প্লেগ রাক্ষসীর কবলে পড়িয়া শয্যাশায়ী হইলেন। শরৎচন্দ্র এই আকস্মিক বিপদে আত্মহারা হইয়া মনের আবেগে চারিদিকে ছুটাছুটি করিলেন, কিন্তু তাঁহার পাড়া-প্রতিবেশী কেহই

নিজেকে বিপন্ন করিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না। অগত্যা তিনি সেবক সমিতির সাহায্যের জন্য আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—ভাই গিরীন, আমার বড় বিপদ স্ত্রীর প্লেগ হয়েছে।

—কি সর্বনাশ! বল কি শরৎদা? কে দেখছে?

—এখনও ডাক্তার ডাকতে পারি নি, মাস-কাবার, হাতে টাকাকড়ি কিছুই নেই।

—ভয় নেই, আমি অপূর্ব ডাক্তার কিংবা ডাক্তার দে-কে সঙ্গে নিয়ে এখনই যাচ্ছি।

—ভাই, তুমি সৎকার সমিতি করে অনেক পুণ্য সঞ্চয় করেছ, আমাকে এ বিপদে রক্ষা কর।

আমি সমিতির আলমারী খুলিয়া রোগীর ব্যবহার্য কতকগুলি জিনিষপত্র, কিছু ঔষধ ও অত্যাবশ্যক দু একটি উপদেশ দিয়া একখানি রিক্সা গাড়ী ডাকিয়া তাঁহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার সঙ্গে করিয়া গিয়া দেখিলাম, রোগিণী একখানি কাঠের তক্তপোষের উপর চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া অচৈতন্য অবস্থায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্টবোধ হইতেছে। একটি বৃদ্ধা মুড়িওয়ালী তাঁহার শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে।...

রোগিণীর লক্ষণ দ্বারা ডাক্তার নিঃসন্দেহে বুঝিলেন, অবস্থা সাংঘাতিক। আমি কিয়ৎক্ষণ ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। শরৎচন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার স্ত্রীর প্রাণরক্ষা করিবার জন্য ডাক্তারবাবুকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার কাতর ভাব দেখিয়া সকলেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।...

কিছুতেই কিছু হইল না, শান্তি দেবী সংসারের দুঃখ কষ্টকে তুচ্ছ

করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। শরৎচন্দ্র পলকহীন দৃষ্টিতে স্ত্রীর মৃত্যু-বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

আমি বাড়ী ফিরিবার পথে সমিতির দু'একটি স্বেচ্ছাসেবককে এই সংবাদ দিতে তাঁহারা প্লেগাতঙ্কে বড়ই ভীত হইয়াছেন জানাইলেন। সাধারণ বন্ধুবান্ধব কয়েকজনের সাহায্যপ্রার্থী হইলে কেহ—'শরৎবাবু আবার বিয়ে করলেন কবে?' কেহ বা 'উনি ত আমাদের সমাজের লোক নন' বলিয়া বিদ্রূপ করিলেন। হতাশ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া শ্মশানে গমনোপযোগী বস্ত্রাদি পরিধান করিলাম এবং বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম।

সেই গভীর রাত্রে তখনই শরৎচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীর শবদাহ করিতেই হইবে। শরৎচন্দ্রের বাসা হইতে শ্মশানঘাট প্রায় সাত মাইল দূরে। শববাহী মাত্র আমি ও শরৎচন্দ্র, কি উপায় হইবে ভাবিয়া দিশাহারা হইলাম।

দেখিতে দেখিতে উন্মত্তের ন্যায় শরৎচন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চেহারা মলিন, মাথার চুল এলোমেলো, চরণদ্বয় নগ্ন, কণ্ঠস্বর রুক্ষ, বলিলেন—ভাই, কোথায় সে চলে গেল, একদণ্ডে যেন একটা প্রলয় হয়ে গেল। কে কে শ্মশানে যাবে, কিছু বন্দোবস্ত হ'ল কি?

আমি সমিতির সভ্যগণের অবস্থা জানাইয়া বলিলাম—শরৎদা, যদি ভদ্রপল্লীতে তোমার বাস হ'ত, আমাদের সমাজের সঙ্গে তোমার মেলামেশা থাকত, তাহ'লে আজ ভাবতে হ'ত না। অন্ততঃ বিশ পঁচিশ জন বন্ধুবান্ধব তোমার স্ত্রীর শবদেহ কাঁধে নিয়ে শ্মশানে যেত, কিন্তু তুমি কখনও তাদের সঙ্গে মেশনি, তোমার বিবাহিত জীবনের কথা অনেকে জানেই না।

আমি একা শরৎচন্দ্রের সহিত তাঁহার বাড়ীতে চলিলাম। এই পথে তখন জনপ্রাণীরও সমাগম ছিল না।

শরৎচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া শবদেহের উপর আছড়াইয়া পড়িলেন এবং 'ওগো, কোথা গেলে গো! তুমি যে আমার সকল অবস্থার সাথী ছিলে' বলিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। নিদারুণ শোকে তাঁহার অন্তর বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল।

প্রতিবেশীদিগের মধ্যে কেহই এই প্লেগ রোগীর শবদাহ করিবার জন্য অগ্রসর হইল না দেখিয়া, এই অবস্থা-সঙ্কটে ক্ষণকালের জন্য বুদ্ধিভ্রষ্ট হইলাম। তারপর একবার শবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শরৎচন্দ্রের বিষাদ দৃষ্টি ও আকুল আবেদনের কথা মনে পড়িল। অগত্যা একখানি কুরঙ্গী, কুলিদের মানুষটানা ঠেলাগাড়ী ভাড়া করিয়া দুইজনে অতিকষ্টে ধরাধরি করিয়া তাহাতে শবদেহ তুলিয়া শ্মশানে লইয়া গেলাম।...

শ্মশানে মধ্যে মধ্যে একটি ভাবপাগল সন্ন্যাসী আসিয়া বাস করিতেন, আমরা সকলেই তাঁহাকে উদাসী বাবাজী বলিয়া সম্বোধন করিতাম। বাবাজীর মুখে অনেক অর্থযুক্ত তত্ত্বকথা শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইত। তাঁহার কণ্ঠে শ্মশান-সঙ্গীত শুনিয়া মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইত।

আমাকে নিঃসঙ্গ দেখিয়া বাবাজী সুন্দররূপে চিতাসজ্জা প্রস্তুত করিয়া দিলেন, শরৎচন্দ্র ও আমি শবদেহ চিতায় তুলিয়া অগ্নি-সংযোগ করায় মুহূর্তমধ্যে সে বহ্নি গগনমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইল। বাবাজী তাহার পর নদী হইতে কলসী কলসী জল আনিয়া চিতা নির্বাণ করিতে করিতে গাহিলেন—

খেলার ছলে হরি ঠাকুর
গড়েছেন এই জগৎখানা,...

শরৎচন্দ্রকে শোকে অধীর দেখিয়া তিনি বলিলেন—বাবা! বিরাটের চিন্তা কর, সান্ত্বনা পাবে, জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যুঃ।

জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে?

…সাধুসঙ্গে শরৎচন্দ্রের মন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল। তিনি বুক ভরা জ্বালা লইয়া গৃহে ফিরিলেন।

এই রাত্রের স্মৃতি এখনও আমার মনে ভীষণ আন্দোলনের সৃষ্টি করে।

শরৎচন্দ্র স্ত্রীর জন্য অনেক দিন পর্যন্ত শোকাচ্ছন্ন ছিলেন। তিনি দুর্গাবাড়ীতে যথারীতি স্ত্রীর শ্রাদ্ধ করিয়া ছিলেন। পরে শুনিলাম, তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর কারণটিও অত্যন্ত দুঃখের। কোন প্লেগ রোগগ্রস্তা দরিদ্র প্রতিবেশিনীর সেবা করিতে গিয়া তিনি নিজে বিপন্ন হইয়াছিলেন।"

কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব শরৎচন্দ্রর একটি জীবনী লিখেছেন। সে গ্রন্থের নাম "শরৎচন্দ্র।" সেই শরৎচন্দ্র গ্রন্থে নরেনবাবু লিখেছেন—

"পরদুঃখকাতর কোমল হৃদয়ের অনুপ্রেরণায় এই সময় শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থায় ব্রহ্মদেশে একটি স্বজাতীয় কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে হয়েছিল। সে কাহিনী গল্প কথার ন্যায় রোমাণ্টিক।

তিনি তখন রেঙ্গুনের যে বাড়ীতে বাস করতেন, তার নীচের তলায় একজন মেকানিক বা কলকব্জার মিস্ত্রী ছিল। জাতিতে সে বাঙালী—চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ, বিপত্নীক। সংসারে একটিমাত্র বিবাহ-যোগ্যা অনূঢ়া কন্যা ছাড়া আর কেউ ছিল না। চক্রবর্তীর চরিত্রে ছিল অনেক দোষ। সন্ধ্যার পর কারখানা থেকে ফিরে এসে বাড়িতে সে এক আড্ডা বসাতো। সেখানে জুটতো যত নেশাখোর মাতাল গেঁজেল কারিকর ও বদমাইসের দল। এরাই ছিল তার বন্ধু ও সঙ্গী। অনেক রাত্রি পর্যন্ত চলতো তাদের হুল্লোড়। মেয়েটিকে খাটতে হ'ত এই সব পাষণ্ডদের নানারকম ফাইফরমাস। চক্রবর্তীকে রেঁধে খাওয়ানো, বাসন মাজা প্রভৃতি সংসারের যা কিছু কাজ সবই করতো এই মেয়েটি। কোনো বিষয়ে একটু কিছু ত্রুটি হ'লেই চক্রবর্তী দিত মেয়েকে ধরে নির্মম প্রহার।

শরৎচন্দ্র সন্ধ্যার পর প্রায়ই বাসায় থাকতেন না। অনেক রাত্রে ফিরে এসে ঘরে শুতেন, আবার সকালে উঠে যেতেন। একদিন রাত্রে শুতে এসে দেখেন, ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। কে তাঁর ঘরে ঢুকে খিল দিয়েছে—চোর নয় ত?—তিনি দরজায় জোর ধাক্কা দিয়ে খুলে দেবার জন্য ডাকতে লাগলেন। একটু পরে দরজা খুলে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল চক্রবর্তীর মেয়ে। থর্ থর্ করে সর্বশরীর কাঁপছে তার তখনও—দুচোখ ভেসে যাচ্ছে অশ্রুজলে। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে, চক্রবর্তী তার বন্ধু পাকা বদমায়েস ও মাতাল ঘোষাল-বুড়োর সঙ্গে মেয়েটির বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছে। ঘোষাল-বুড়ো সেজন্য চক্রবর্তীকে কিছু টাকাও নাকি দিয়েছে। আজ নেশার ঝোঁকে, চক্রবর্তীর মেয়েকে সে নিজের পত্নী বলে দাবী করে অন্দরের মধ্যে তেড়ে এসেছিল। মেয়েটি ভয়ে পালিয়ে এসে দাদাঠাকুরের ঘরে খিল দিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। কিন্তু এমন করে আর কদিন চলবে! মেয়েটি শরৎচন্দ্রের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল, আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আপনি আমাকে বাঁচান।

শরৎচন্দ্র মেয়েটিকে সে রাত্রের মত সেই ঘরেই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাতে বলে নীচে নেমে চলে গেলেন। বলে গেলেন, ভয় নেই, কাল সকালে আমি ফিরে এসে এর বিহিত করবো।

পরের দিন চক্রবর্তীকে মেয়ের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শরৎচন্দ্র পড়লেন বিপদে। চক্রবর্তী বলে—মেয়ে যোগ্য হয়েছে, বিয়ে দেব না? আমি গরীব মানুষ, এই বিদেশে ওর চেয়ে ভাল পাত্র আর কোথা পাবো? ঘোষালের টাকা আছে, ছুঁড়িটা ভাত কাপড়ের দুঃখ পাবে না। একটু নেশা ভাঙ করে—হোক্। সে তো আমিও করি। আর যদি বয়সের কথা বল বাবু—বেটা ছেলের আবার বয়স কি?

শরৎচন্দ্র আনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু চক্রবর্তী সে

পাত্রই নয়। ঘোষালের দেনা শরৎচন্দ্র মিটিয়ে দেবেন, তবুও বলে—না, মেয়ের আমার বিয়ে দিতে হবে ত? শেষকালে চক্রবর্তী ধরে বসলো—এতই যদি তোমার প্রাণে দয়ামায়া বাবু, তুমিই কেন এই গরীব বামুনের মেয়েটাকে নিয়ে আমার জাত কুল রক্ষা কর না।

অগত্যা শরৎচন্দ্রকেই নিতে হয়েছিল সেই মেয়েটির ভার। তাকে নিয়ে শরৎচন্দ্রের দিন সুখেই কাটছিল। একটি পুত্র সন্তানও হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য তখনও ফিরছিল তাঁর পাছে পাছে। রেঙ্গুনে আবার একবার প্লেগের দারুণ মহামারী দেখা দিল—শরৎচন্দ্রের পত্নী, পুত্র সেই প্লেগের আক্রমণে আট-চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে যেন স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল। কোমলহৃদয় শরৎচন্দ্র সেদিন বালকের ন্যায় অধীর ভাবে কেঁদেছিলেন। তাঁর সেই সকাতর অশ্রু বিসর্জন দেখে রেঙ্গুনের তাঁর পরিচিত বন্ধু-বান্ধবরা চেখের জল রোধ করতে পারেন নি। রেঙ্গুনের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্টর মিঃ জি, এন, সরকার বা গিরীন্দ্র বাবু—এই বিপদে শরৎচন্দ্রকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন।"

শরৎচন্দ্রের শান্তিদেবীকে বিবাহ করার এই যে চমকপ্রদ কাহিনীটি নরেন্দ্র দেব তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, এই কাহিনীটি তিনি কোথায় পেলেন, এ সম্বন্ধে আমি নরেনবাবুকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে নরেনবাবু বলেছিলেন—শরৎচন্দ্রের এই বিবাহ কাহিনী এবং তাঁর পুত্রের কাহিনীটিও আমি গিরীন্দ্রনাথ সরকারের কাছেই শুনেছিলাম।

গিরীনবাবু তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—"(শরৎচন্দ্র) স্বজাতীয় কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যাকে সমাজের অবিচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্ব ইচ্ছায় বিবাহ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন।" গিরীনবাবুর এই উক্তিতেই মনে হয়, তিনি নরেনবাবু বর্ণিত শরৎচন্দ্রের ঐ চমকপ্রদ বিবাহ কাহিনীটিরই ইঙ্গিত করেছেন।

কিন্তু গিরীনবাবু তাঁর গ্রন্থে শান্তি দেবীর শবদাহের বিস্তৃত বিবরণ লিখলেও শরৎচন্দ্রের পুত্রের শবদাহের বা তার অস্তিত্বের কথা পর্যন্তও লিখলেন না কেন? তবে কি শরৎচন্দ্রের কোন পুত্র সন্তান ছিল না? বা তিনি কি নরেন্দ্র দেবের কাছে শরৎচন্দ্রের পুত্রের কাহিনীটি বলেন নি?

কিন্তু তা ত নয়, নরেনবাবু বলেন, গিরীনবাবু তাঁর কাছে শরৎচন্দ্রের পুত্রের কথাও বলেছেন।

তাহলে গিরীনবাবু তাঁর গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের পুত্রের কথা লিখলেন না কেন?

এ সম্বন্ধে এই বলা যেতে পারে যে, কি শরৎচন্দ্রের বিবাহ কাহিনী (যা নরেনবাবু গিরীনবাবুর কাছে শুনে তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন), আর কি শরৎচন্দ্রের পুত্রের শবদাহের কাহিনী, কোনটারই মধ্যে গিরীনবাবুর আত্মকাহিনী বলার তেমন কোন সুযোগ না থাকায় তাঁর গ্রন্থে ঐ কাহিনীগুলির উল্লেখ করেন নি। কেন না সত্য কথা বলতে কি, গিরীনবাবুর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থটি একরূপ তাঁরই আত্মকাহিনী। আর গিরীনবাবু এ বিষয়ে কিছুটা সচেতন ছিলেন বলেই, তিনি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—"তাঁহার (শরৎচন্দ্রের) সহিত আমার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকায় স্থানে স্থানে আত্মকাহিনীর বাহুল্য দোষ ঘটিয়াছে। সেজন্য সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ ক্ষমা করিবেন।"

যাই হোক, শরৎচন্দ্রের যে একটি পুত্র হয়েছিল এবং সেই পুত্রটি যে এক বৎসর জীবিত ছিল, এ কথাটি সত্য বলেই মনে হয়। এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের নিজের মুখের একটি উক্তি এখানে বলছি।

শরৎচন্দ্র যখন হাওড়ায় বাজে শিবপুরে অবস্থান করতেন, তখন কবি গিরিজাকুমার বসু তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন। শরৎচন্দ্র গিরিজাবাবু এবং তাঁর স্ত্রী লেখিকা তমালতলা বসুকে খুবই স্নেহ করতেন। শরৎচন্দ্রের

বাজে শিবপুরে অবস্থানকালে এই বন্ধু-দম্পতির একটি যুবক পুত্র পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করে অকালে মারা যায়। ছেলেটি মারা গেলে, গিরিজাবাবু এবং তাঁর স্ত্রী তমাললতা দেবী যখন খুব কান্নাকাটি করছিলেন, তখন শরৎচন্দ্র তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে, তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, তোমরা তবু ত ওকে এত বৎসর ধরে লালন পালন করলে, কিন্তু আমি যে এক বৎসরের বেশী লালন-পালন করতে পাইনি।

তমাললতা দেবী তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র কর্তৃক তাঁদের প্রতি সান্ত্বনা দানের এই কথাটি উল্লেখ করেছেন।

গিরিজাবাবু ও তমাললতা দেবীর পুত্র শোকের সময় শরৎচন্দ্র মিথ্যা করে তাঁর নিজের পুত্রশোকের কাহিনী তুলে তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে ছিলেন, একথা বিশ্বাস হয় না। কেননা, মানুষ ঐ সময় ঐ ভাবে মিথ্যা কথা বলতে পারে না। তাই মনে হয়, শরৎচন্দ্র শান্তি দেবীকে যে বিবাহ করেছিলেন এবং শান্তি দেবীর গর্ভে যে তাঁর একটি পুত্র জন্মেছিল, এ কথা সত্য।

হিরণ্ময়ী দেবী

শরৎচন্দ্রের প্রথম পক্ষের স্ত্রী শান্তি দেবীর মৃত্যুতে শরৎচন্দ্রের জীবনে যে পরিবর্তন ঘটেছিল এবং তিনি কিভাবে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন, সে সম্বন্ধে গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর "ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র" গ্রন্থে লিখেছেন :—"এই ঘটনায় (শান্তি দেবীর মৃত্যু) শরৎচন্দ্রের জীবনের অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল। তিনি ঐ কদর্য পল্লী ত্যাগ করিয়া শহরে কয়েকটি বন্ধু-বান্ধবের সহিত একত্রে বাসা করিয়াছিলেন। দুই বৎসর পরে শরৎচন্দ্র ছুটি লইয়া কলিকাতা যান এবং দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক রেঙ্গুনে আসিয়া আমার বাড়ীর সন্নিকটে ৩৬নং গলিতে বাড়ী ভাড়া করিয়া কয়েক বৎসর ছিলেন। তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই। দুইটি কুকুর ও কয়েকটি পক্ষীশাবক তাঁহার অপত্য-স্নেহের অধিকারী হইয়াছিল।"

শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় বিবাহ সম্বন্ধে নরেন্দ্র দেব তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন :—"মধ্যে মধ্যে অল্প কয়েক দিনের জন্য বাঙ্গলা দেশে এসে ভাই বোনদের খবর নিয়ে, আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে দেখাশুনা করে, শরৎচন্দ্র আবার ফিরে যেতেন রেঙ্গুনে। এমনি এক আসা-যাওয়ার মাঝে হিরণ্ময়ী দেবী নামে একটি অসহায়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ রমণীকে তিনি দ্বিতীয়বার সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ইনি মেদিনীপুর-নিবাসী ৺কৃষ্ণদাস অধিকারী মহাশয়ের কন্যা।"

এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরৎচন্দ্র সংক্রান্ত বই দুখানির কথাও মনে পড়ে। ব্রজেনবাবু তাঁর এই দুখানা বইয়েই হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্রের জীবন-সঙ্গিনী বলে গেছেন। কোথাও স্ত্রী বলেন নি, বা শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে বিয়ে করেছিলেন,

এরূপ কোন কথা লেখেন নি। জীবন-সঙ্গিনী শব্দের অর্থ স্ত্রী হয়, কিন্তু স্ত্রী ছাড়া জীবন-সঙ্গিনী অর্থে শুধু জীবন-সঙ্গিনীও হতে পারে। তাছাড়া ব্রজেনবাবু যে ইচ্ছা করেই স্ত্রী না লিখে জীবন-সঙ্গিনী লিখেছেন, একথা তিনি আমাকে কয়েকবার বলেছেন। তিনি বলতেন—শরৎচন্দ্রের এই বিবাহ ঠিক আমরা যাকে সামাজিক বিবাহ বলি, তা ছিল না। অতএব আমি তাকে বিবাহ বলতে পারি না। এই জন্যই আমি স্ত্রী না লিখে জীবন-সঙ্গিনী লিখেছি।

নরেনবাবু লিখলেন, সঙ্গিনী। ব্রজেনবাবু বললেন, জীবন-সঙ্গিনী। এখন প্রশ্ন ওঠে, তবে কি সত্যই শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে বিয়ে করেন নি? শুধু জীবন-সঙ্গিনী হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন?

শরৎচন্দ্রের এই হিরণ্ময়ী দেবীকে গ্রহণ করা সম্বন্ধে, হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁর মুখে এবং শরৎচন্দ্রের নিকট আত্মীয়দের কাছ থেকে যা শুনেছি, এখানে আমি এখন সেই কথাই বলছি—

হিরণ্ময়ী দেবীর বাপের বাড়ী মেদিনীপুর জেলায় শালবনীর কাছে শ্যামচাঁদপুর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম কৃষ্ণ চক্রবর্তী। হিরণ্ময়ী দেবীর অতি শৈশব অবস্থাতেই তাঁর মা মারা যান। কৃষ্ণবাবুর এক বন্ধু রেঙ্গুনে থাকতেন। সেই সূত্রেই স্ত্রীর মৃত্যুর কয়েক বছর পরে কৃষ্ণবাবু কন্যাকে নিয়ে রেঙ্গুনে যান। রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণবাবুর পরিচয় হয়, এবং এই পরিচয়ের ফলেই কৃষ্ণবাবু রেঙ্গুনেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দেন। বিয়ের সময় হিরণ্ময়ী দেবীর বয়স ছিল ১৪ বছর।

কন্যার বিয়ের পর কৃষ্ণবাবু দেশে তাঁর গ্রামে ফিরে এসেছিলেন। কৃষ্ণবাবুর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। শরৎচন্দ্র তার শ্বশুর মশায়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য রেঙ্গুন থেকে প্রতি মাসে ১০৲ টাকা করে

পাঠিয়ে দিতেন। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকার সময়ও প্রতি মাসে তার শ্বশুর মশায়কে ঐ ১০৲ টাকা করেই পাঠাতেন। শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরে থাকার সময়ই তাঁর শ্বশুর মশায় মারা যান। শরৎচন্দ্র তাঁর শ্বশুর মশায়ের মৃত্যু সংবাদ জানতে পারেন, যেদিন তাঁর পাঠানো মণি অর্ডারের টাকা ফেরৎ আসে। ঐ দিনই শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে তাঁর বাবার মৃত্যু সংবাদ জানান।

হিরণ্ময়ী দেবী রেঙ্গুন থেকে এসে বাজে শিবপুরে থাকার সময় একবার তার বাপের বাড়ী গিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি তাঁর মেজ-জায়ের ছেলে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে নিজের কাছে রেখেছিলেন এবং তাঁকে নিজের ছেলের মতন করে মানুষ করেছিলেন। এই হিসাবে রামকৃষ্ণবাবুর তাঁর জ্যাঠাইমাকে জ্যাঠাইমা না বলে মা বলেই ডাকতেন। রামকৃষ্ণবাবু বয়স এখন (এই প্রবন্ধ লেখার সময়) প্রায় ৫৫ বৎসর। এখনও তিনি তাঁর জ্যাঠাইমার কথা বলতে গেলে মা বলেই উচ্চারণ করে থাকেন। রামকৃষ্ণবাবু তাঁর এই মা অর্থাৎ জ্যাঠাইমার কাছে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হিরণ্ময়ী দেবীর বিয়ে সম্বন্ধে যা শুনেছিলেন, সে সম্বন্ধে বলেন—শরৎচন্দ্র সস্ত্রীক রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে বাজে শিবপুরে বাসা করলে অনিলা দেবী ভাই-এর বাড়ীতে যান। সেখানে গিয়ে একদিন তিনি কথায়-কথায় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হিরণ্ময়ী দেবীর বিয়েটা কিভাবে হয়, সে সম্বন্ধে তিনি হিরণ্ময়ী দেবীকে প্রশ্ন করেন। উত্তরে হিরণ্ময়ী দেবী অনিলা দেবীকে বলেছিলেন, হিরণ্ময়ী দেবী যখন রেঙ্গুনে তাঁর বাবার কাছে থাকতেন, সেই সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বাবার বিশেষ পরিচয় ছিল।

এই বিশেষ পরিচয়ের জোরেই হিরণ্ময়ী দেবীর বাবা একদিন সকালে কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করে বলেন—আমার মেয়েটির এখন বিয়ের বয়স হয়েছে। একে সঙ্গে নিয়ে একা বিদেশ বিভুঁইয়ে কোথায় থাকি! আপনি যদি অনুগ্রহপূর্বক আমার এই কন্যাটিকে গ্রহণ করে আমায় দায়মুক্ত করেন তো গরীব ব্রাহ্মণের বড় উপকার হয়। আর একান্তই যদি না নিতে চান তো, আমায় কিছু টাকা দিন। আমি মেয়েকে নিয়ে দেশে ফিরে যাই। দেশে গিয়ে মেয়ের বিয়ে দিই।

হিরণ্ময়ী দেবীর বাবা শেষে শরৎচন্দ্রের কাছে টাকার কথা বললেও, তিনি বিশেষ করে শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেন, যেন, তিনিই তাঁর কন্যাটিকে গ্রহণ করেন।

শরৎচন্দ্র প্রথমে অরাজী হলেও হিরণ্ময়ী দেবীর বাবার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত হিরণ্ময়ী দেবীকে বিয়ে করেন।

শরৎচন্দ্রের সহিত হিরণ্ময়ী দেবীর বিবাহ সম্বন্ধে এই গেল, আমার শোনা কথা। এ দিকে বেহালার জমিদার শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন মণীন্দ্রনাথ রায়ও একবার শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়ীতে গিয়ে কথা-প্রসঙ্গে হিরণ্ময়ী দেবীকে তাঁর বিয়ের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। হিরণ্ময়ী দেবীর মুখে শুনে মণিবাবু ১৩৬১ সালের আশ্বিন সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে 'হিরণ্ময়ী দেবী' নামক প্রবন্ধ লেখেন—

"কেন জানিনা এক দুর্বল মুহূর্তে একটি অসঙ্গত প্রশ্ন বৌদিকে জিজ্ঞাসা করলাম। আচ্ছা বৌদি, আপনার বিয়ে কোথায় হয়েছিল, রেঙ্গুনে না এখানে? এই প্রসঙ্গে পাঠকদের জানাতে চাই যে, আমি নিজে বহুদিন পূর্বে একবার দাদাকে ঐ একই প্রশ্ন করছিলাম, তাতে তিনি বলেছিলেন যে, মেদিনীপুরে যখন তিনি ছিলেন, তখন এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের এক অসুন্দরী অরক্ষণীয়া কন্যাকে বিবাহ করে তিনি

ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হতে মুক্ত করেছিলেন। এর বেশী কিছু আমিও জিজ্ঞাসা করিনি, তিনিও বলেন নি। আজকাল নানা কাগজে শরৎ-প্রসঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মন্তব্য পড়ি, তাই এতটুকু লেখবার লোভ সামলাতে পারলাম না: এখন পাঠক-সমাজ নিজেরাই এর সত্যাসত্য নির্ণয় করে নেবেন। বৌদি বললেন যে, তিনি মেদিনীপুরের মেয়ে ও দাদা তাঁকে সেখানেই বিবাহ করেছিলেন, তারপর তাঁকে নিয়ে তিনি রেঙ্গুনে যান। বললেন, আমার বাবা বড় গরীব ছিলেন, তোমার দাদা বিয়ের পর রেঙ্গুন থেকে নিয়মিত প্রতি মাসে বাবাকে মণিঅর্ডার করে সাহায্য পাঠাতেন। আমি লেখাপড়া জানিনা, বাবার হাতের সই করা টাকা পাওয়ার রসিদ যখন ফিরে যেতো রেঙ্গুনে, তখনই জানতাম যে, বাবা আমার ভালো আছেন—এমন অনেক দিন হয়েছিল। তারপর একদিন টাকার রসিদ না এসে টাকা সমেত মণিঅর্ডার তোমার দাদার নামে ফিরে এলো। সেইদিনই জানলাম, বাবা আমার আর ইহজগতে নেই। সেদিন বেশ মনে পড়ে আজও, কী কান্নাই না কেঁদেছিলাম আমি। ১৪ বছরের মেয়ে বিয়ে করে তোমার দাদা এনেছিলেন—এই দীর্ঘদিন আর বাবাকে দেখিনি ; শুধু আশা করে বসে থাকতাম বাবার হাতের সই করা রসিদখানির জন্য। সইটাই তাঁর বার বার দেখতাম—হ্যাঁ বাবারই সই, তিনি ভাল আছেন, কত আনন্দই না পেতাম। তারপর তাও একদিন শেষ হয়ে গেল।"

এখানে মণিবাবুর লেখায় দেখা যাচ্ছে—(১) শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে মেদিনীপুরে বিয়ে করেছিলেন এবং তারপর তিনি তাঁকে রেঙ্গুনে নিয়ে যান। (২) হিরণ্ময়ী দেবী বিয়ের পর তাঁর বাবাকে আর দেখেন নি এবং রেঙ্গুনে থাকবার সময়ে তিনি তাঁর বাবার মৃত্যু সংবাদ জানতে পারেন।

এদিকে হিরণ্ময়ী দেবী কিন্তু আমাকে বলেছিলেন যে, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনেই তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। আর তাঁর বাবার মৃত্যু সংবাদ তিনি বাজে শিবপুরে থাকবার সময়েই জানতে পেরেছিলেন।

হিরণ্ময়ী দেবী আমাকে বলেছিলেন, রেঙ্গুনেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল। রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কথা থেকেও জানা যাচ্ছে, হিরণ্ময়ী দেবী অনিলা দেবীকেও বলেছিলেন, রেঙ্গুনেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। অনিলা দেবীর মেজ-জা সুকুমারী দেবীর কাছে শুনলাম, হিরণ্ময়ী দেবী তাঁকেও একবার বলেছিলেন যে, রেঙ্গুনেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল।

এখন মণিবাবু হিরণ্ময়ী দেবীর মুখে শুনেছেন বলে যা লিখেছেন, তা যদি সত্য হয়, তাহলে এই দাঁড়ায় যে, হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর বিয়ের সম্বন্ধে মণিবাবুর কাছে এক রকম কথা বলেছেন, আবার আমার কাছে, অনিলা দেবীর কাছে এবং সুকুমারী দেবীর কাছে আর এক রকম কথা বলেছেন।

হিরণ্ময়ী দেবী মণিবাবুকে কি বলেছিলেন, জানি না। তবে কিন্তু তাঁকে একদিন সামতাবেড়েয় মণিবাবুর এই লেখার কথা শোনালে, তিনি প্রতিবাদ করে আমাকে বলেছিলেন যে, আমাকে যা বলেছেন তাই ঠিক।

হিরণ্ময়ী দেবী আমাকে যখন এই কথা বলেন, তখন শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর মেজ দেওরের ছেলে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং সেজ দেওরের ছেলে ব্রজদুর্লভ মুখোপাধ্যায় এঁরাও আমার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি যে, শরৎচন্দ্র সামতাবেড়েয় তাঁর দিদিদের বাড়ীর কাছে গিয়েই বাড়ী করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের দিদির কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাই তাঁর দিদির এই দেওর-পোরাই হিরণ্ময়ী দেবী যখন সামতাবেড়েয় থাকতেন, তখন তাঁর দেখাশোনা করতেন।

এবার আর একটি কথা, মণিবাবু বলেছেন—হিরণ্ময়ী দেবী বিয়ের পর তাঁর বাবাকে দেখেন নি এবং মণিঅর্ডারের টাকা ফিরে আসার ব্যাপারটা ঘটেছিল, শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে ছিলেন। মণিবাবুর এ কথাও মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, হিরণ্ময়ী দেবী বিয়ের পর তাঁর বাবাকে আরও দেখেছেন এবং টাকা ফিরে আসার ব্যাপারটা ঘটেছিল শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে বাজে শিবপুরে যখন অবস্থান করেছিলেন, সেই সময়েই।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য—শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর মেজ দেওরের ছেলে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং সেজ দেওরের ছেলে ব্রজদুর্লভ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, তাঁরা উভয়েই হিরণ্ময়ী দেবীর বাবাকে শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের বাড়ীতে দেখেছেন। অনিলা দেবীর ছোট দেওর তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় বলেন যে, শরৎচন্দ্র তাঁর শ্বশুর মশায়কে যে টাকা মণিঅর্ডার করতেন, অনেক সময় পোষ্ট অফিসে গিয়ে তিনিই মণিঅর্ডার করে আসতেন। শরৎচন্দ্রের পুস্তকের প্রকাশক ও তাঁর বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মশায় আমাকে একদিন বলেছিলেন যে, শরৎচন্দ্রের নির্দেশক্রমে শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের প্রতিবেশী ভূতনাথবাবু একবার হিরণ্ময়ী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে মেদিনীপুরে তাঁর বাপের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। হিরণ্ময়ী দেবীর বাবা তখন বেঁচেছিলেন।

অতএব মণিবাবু যে লিখেছেন, হিরণ্ময়ী দেবী রেঙ্গুনে থাকার সময় মণিঅর্ডারের টাকা ফিরে যাওয়ায়, তিনি তাঁর বাবার মৃত্যু সংবাদ জানতে পারেন, তা ঠিক নয়।

এখন কথা হচ্ছে—মণিবাবু বলেছেন, হিরণ্ময়ী দেবীর মুখ থেকে শুনে তিনি এই কথা লিখেছেন। হিরণ্ময়ী দেবী যদি এই কথা বলে থাকেন, তাহলে মণিবাবুর কাছে তিনি ঠিক কথা বলেন নি।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র দেব তাঁদের গ্রন্থে হিরণ্ময়ী

দেবীকে শরৎচন্দ্রের স্ত্রী না বলে 'জীবন-সঙ্গিনী' ও 'সঙ্গিনী' বলেছেন। এঁদের মতে আমরা যাকে সামাজিক বিয়ে বলি, শরৎচন্দ্র নাকি হিরণ্ময়ী দেবীকে সেরূপ ভাবে বিয়ে করেন নি। অবশ্য এঁরা এ কথা যে কি ভাবে জেনেছেন, তারও কোন প্রমাণ দেন নি।

অপর পক্ষে হিরণ্ময়ী দেবী নিজে বলেছেন, তাঁর বিয়ে হয়েছিল, শরৎচন্দ্রের আত্মীয়রাও বলছেন বিয়ে হয়েছিল, শরৎচন্দ্র নিজেও হিরণ্ময়ী দেবীকে স্ত্রী বলে গেছেন। আর সে কথা শুধু মুখেই নয়, লিখিত ভাবেও তিনি বলে গেছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি যে উইল করেন, তাতে হিরণ্ময়ী দেবীকে তিনি স্ত্রীই বলেছেন, এবং তিনি তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে তাঁর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি জীবন সত্বে দান করে যান। হিরণ্ময়ী দেবীর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র অমলকুমার চট্টোপাধ্যায় সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন একথাও লিখে যান। অতএব ব্রজেনবাবু ও নরেনবাবুর ন্যায় হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্রের জীবন-সঙ্গিনী বা সঙ্গিনী না বলে স্ত্রী বলাই ঠিক বলে মনে করি।

তবে একথা হয়তো সত্য যে, দূর দেশে রেঙ্গুনে যেখানে শরৎচন্দ্র আত্মীয়স্বজনহীন অবস্থায় একা ছিলেন এবং হিরণ্ময়ী দেবীর বাবাও প্রায় ঐ অবস্থাতেই সেই বিদেশে মাত্র কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে ছিলেন, সেখানে হিন্দু-বিবাহের সকল প্রকার সামাজিক প্রথা ও লোকাচারগুলি যথাযথ পালন করা সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু ঐ সঙ্গে সঙ্গে একথাও অনুমান করা যেতে পারে যে, হিরণ্ময়ী দেবীর পিতা নিজে উপস্থিত থেকে যখন শরৎচন্দ্রকে কন্যাদান করেছেন, তখন নিশ্চয়ই যাই হোক্ অন্ততঃ নাম মাত্রও একটা কিছু বিবাহ অনুষ্ঠান হয়েছিলই।

আজকাল শুনি কালীঘাট ও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পরস্পর প্রণয়মগ্ন বহু যুবক যুবতী কালীকে সাক্ষী রেখে মালা বদল করে নিজেরাই

বিবাহকার্য সমাধা করে নেয়। আর কালের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজে বিবাহ প্রথারও তো পরিবর্তন হয়ে চলেছে—যেমন অসবর্ণ-বিবাহ, সধবা বিবাহ, এমন কি বারবণিতা বিবাহ পর্যন্ত। এই প্রকারের সমস্ত বিবাহই আজকাল হিন্দুসমাজে বিবাহ বলে স্বীকৃত হচ্ছে। কেউ কেউ বলেছেন, শরৎচন্দ্র শৈবমতে বিবাহ করেন। শৈবমতেই হোক আর বৈষ্ণবমতেই হোক্, যাই হোক, একটা মতে তো বিবাহ হয়েছিল। আজকাল তো আর্য সমাজের মতে, রেজেষ্ট্রী মতে নানা প্রকারের বিবাহ হচ্ছে এবং সমাজ সে সবই বিবাহ বলে মেনে নিচ্ছে। তাই ব্রাহ্মণ্য, শৈবমত, যে মতেই হোক্ শরৎচন্দ্রের বিবাহকে বিবাহ বলতে ক্ষতি কি? বিশেষ করে হিরণ্ময়ী দেবী এবং শরৎচন্দ্র তাঁরা নিজেরা যখন বলছেন, বিবাহ।

নরেনবাবু হিরণ্ময়ী দেবীর বাবার নাম বলেছেন—কৃষ্ণদাস অধিকারী। অথচ শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর ছোট দেওর তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, অনিলা দেবীর মেজ দেওরের ছেলে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং সেজ দেওরের ছেলে ব্রজদুর্লভ মুখোপাধ্যায় এঁরা সকলেই বলেন, হিরণ্ময়ী দেবীর বাবা চক্রবর্তী উপাধিধারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনকড়িবাবু বলেন, শরৎচন্দ্র তাঁর শ্বশুর মশায়কে প্রতি মাসে যে টাকা পাঠাতেন, অনেক সময় তিনিই সেই টাকা পোষ্ট অফিসে গিয়ে মণিঅর্ডার করে এসেছেন। তাঁর বেশ মনে আছে যে, হিরণ্ময়ী দেবীর বাবার উপাধি চক্রবর্তীই ছিল। রামকৃষ্ণবাবু এবং ব্রজদুর্লভবাবু বলেন, শরৎচন্দ্রের শ্বশুর যে 'চক্রবর্তী' ছিলেন, একথা তাঁরা শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে শুনেছেন। হিরণ্ময়ী দেবীর বাবা চক্রবর্তী ছিলেন কিনা, একথা হিরণ্ময়ী দেবীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনিও একথা সমর্থন করেছিলেন। সামতাবেড়েয় গিয়ে আমি যেদিন হিরণ্ময়ী

দেবীকে তাঁর বাবার নাম জিজ্ঞাসা করি, তখন রামকৃষ্ণবাবু এবং ব্রজদুর্লভবাবু এঁরাও আমার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এবং হিরণ্ময়ী দেবীর বাবার উপাধি চক্রবর্তী একথা এঁরা আগেই বলে ফেলায় হিরণ্ময়ী দেবী এঁদের কথাই সমর্থন করেন। তবে তাঁর বাবার নাম যে 'কেষ্ট' একথা তিনি নিজেই বলেন।

হিরণ্ময়ী দেবীর কাছে শুনেছিলাম, তাঁর বাপের বাড়ী মেদিনীপুর জেলায় শালবনীর নিকটে শ্যামচাঁদপুর গ্রামে। শালবনীর নিকটে সত্যই শ্যামচাঁদপুর আছে কিনা এবং থাকলে সেই গ্রামে কৃষ্ণদাস অধিকারী বা চক্রবর্তী নামে কোন লোক ছিলেন কিনা জানবার জন্য একদিন আমি শালবনী গিয়েছিলাম। শালবনীতে গিয়ে শুনলাম, সেখান থেকে প্রায় মাইল ছয় দূরে শ্যামচাঁদপুর। তবে একা সে পথে যাওয়া বিপজ্জনক। লোকালয়-বর্জিত একটানা ঘন শালবনের মধ্য দিয়ে সরু পথ। প্রায় মাইল দুই করে এমনি ঘন দুটো শালবন পার হতে হয়। বাকি পথটা ফাঁকা মাঠ, মাঝে একটা নদী। এই পথে হিংস্র জন্তুর চেয়ে চোর ডাকাতের উপদ্রব ছিল বেশী। আমি যেদিন যাই, শুনলাম তার মাত্র দুদিন আগেই একটা লোককে শালবনের পথে ডাকাতে ঠেঙিয়ে মেরেছে। ঐ বছর শালবনী অঞ্চলে অনাবৃষ্টি হেতু ফসল না হওয়ায় পথে এই চুরি ডাকাতি একটু বেশী রকম বেড়েছিল। যাই হোক্, আমি যেদিন যাই, শালবনীতে প্রতি সপ্তাহে একদিন করে যে বিরাট হাট হয়. সেদিন সেই হাটবার ছিল। শ্যামচাঁদপুরের বহুলোক ঐ হাটে আসায় তাদের সঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে শ্যামচাঁদপুরে যাই। গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম, কৃষ্ণদাস অধিকারী নামে একজন লোক সত্যই ঐ গ্রামে ছিলেন। প্রায় বছর ৩৫ আগে তিনি মারা গেছেন। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন।

কৃষ্ণদাস অধিকারীর ভ্রাতুষ্পুত্র হরিদাস দাস অধিকারীর সঙ্গে আলাপ করলাম। তখন তাঁর বয়স প্রায় ৮০। তিনি বললেন—

কাকা কৃষ্ণদাস অধিকারীর পুত্র-সন্তান ছিল না, শুধু চারটি কন্যা ছিল। ছোটটির নাম মোক্ষদা। কাকীমা যখন মারা যান, তখন মোক্ষদার বয়স বছর আষ্টেক। কাকীমা মারা গেলে, কাকা মোক্ষদাকে নিয়ে বিদেশ চলে যান। কাকা তাঁর অপর মেয়েদের আগেই বিয়ে দিয়েছিলেন।

হিরণ্ময়ী দেবীর নাম যে মোক্ষদা এবং তাঁর যে একাধিক বোন ছিল, একথা হিরণ্ময়ী দেবী আমাকে একদিন বলেছিলেন। অতএব শ্যামচাঁদপুরের এই কৃষ্ণদাস অধিকারীই যে হিরণ্ময়ী দেবীর পিতা তাতে আর সন্দেহ রইল না। কিন্তু হিরণ্ময়ী দেবীর বাবার উপাধি সামতা-বেড়ের চক্রবর্তী শুনে এসে, এখানে যে অধিকারী শুনলাম, তার কি? এ সম্বন্ধে শ্যামচাঁদপুরে যা দেখলাম, তাতে করে ব্যাপারটা এইরূপ ঘটেছিল বলেই অনুমান করা যেতে পারে।

শ্যামচাঁদপুরে চক্রবর্তী উপাধিধারী অনেক লোক বাস করেন। তাঁদের মুখেই শুনলাম, আগে তাঁদের উপাধি অধিকারী ছিল। তাঁরা অধিকারী বদলে চক্রবর্তী উপাধি নিয়েছেন। এঁরা নিজেদের রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিলেন।

শ্যামচাঁদপুরের অধিকারীরা সকলেই চক্রবর্তী হলেন দেখে কৃষ্ণদাস অধিকারীরও চক্রবর্তী হওয়া এবং ব্রাহ্মণ শরৎচন্দ্রকে কন্যাদানের জন্য তিনি বৈষ্ণব হয়েও নিজেকে বিদেশে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেওয়াটা এমন কিছুই অসম্ভব নয়।

শরৎচন্দ্র তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে নিয়ে কখনও কোন সভা-সমিতিতে যেতেন না। আর অত্যন্ত নিকট বন্ধুবান্ধবদের কাছে ছাড়া তিনি হিরণ্ময়ী দেবীর নামও উচ্চারণ করতেন না। তাই অনেকে আবার এমনও জানত যে, শরৎচন্দ্র আদৌ বিয়েই করেন নি। যারা

শরৎচন্দ্রকে এইভাবে জানতো, শরৎচন্দ্র তাদের কোন সভা-সমিতিতে গেলে, তারা সভায় শরৎচন্দ্রকে অবিবাহিত, চিরকুমার বলে ঘোষণা করত। শরৎচন্দ্র সেখানে এ সম্বন্ধে হ্যাঁ, না কোন কথা বলতেন না। শুধু মজা উপভোগ করতেন।

শ্রীনরেন্দ্র দেব তাঁর "শরৎচন্দ্র" গ্রন্থে তাই লিখেছেন—

"অনেকেরই মনে এই সুদৃঢ় ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধ ছিল যে, শরৎচন্দ্র অকৃতদার। কোনো সঙ্ঘ-সমিতিতে শরৎচন্দ্রের পরিচয় দেবার সময় তাঁর পূর্ব-পরিচিত অনেকেই তাঁকে চিরকুমার জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করতেন। শরৎচন্দ্র শুনে নীরবে মুখ টিপে হাসতেন, কোন প্রতিবাদ জানাতেন না। এ যেন তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল।"

এ তো না হয় তাঁকে অবিবাহিত, চিরকুমার বলে প্রচার করা, কিন্তু সত্যই শরৎচন্দ্রের এমনি স্বভাব ছিল যে, যেখানে তাঁর বিবাহিত জীবন নিয়েও লোকে নানা রকমের আজগুবি কল্পনা করে প্রচার করত, সেখানেও তিনি চুপ করে থাকতেন, কোন প্রতিবাদ করতেন না। এই চুপ করে থাকার ফলে অনেক সময় তাঁকে অপমানিত হতে হয়েছে।

যা মিথ্যা তার কোনও প্রতিবাদ না করাই ছিল যেন শরৎচন্দ্রের একটা স্বভাব। তাই লোকে তাঁর জীবনের ইতিহাস নিয়ে তাদের ইচ্ছামত প্রচার করে বেড়ালেও তিনি তার প্রতিবাদ করতেন না। শরৎচন্দ্র তাঁর সাতান্ন বছর বয়সের সময় তাঁর এই স্বভাবের কথা উল্লেখ করে একটি প্রবন্ধে তাই লিখেছিলেন—"...আমার বিগত জীবনের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত উদাসীন। জানি এ লইয়া বহুবিধ জল্পনা-কল্পনা ও নানাবিধ জনশ্রুতি সাধারণ্যে প্রচারিত আছে, কিন্তু আমার নির্বিকার আলস্যকে তাহা বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতেও পারে

না। শুভার্থীরা মাঝে মাঝে উত্তেজিত হইয়া আসিয়া বলেন, এই সব মিথ্যের আপনি প্রতিকার করবেন না? আমি বলি, মিথ্যে যদি থাকে ত সে প্রচার আমি করিনি, বলগে! তাঁরা রাগিয়া জবাব দেন—লোকে যে আপনাকে অদ্ভুত ভাবে, তার কি? আমি বলি, সে দায়ও তাঁদের, কিন্তু এই সাতান্ন বছরেও যদি ক্ষতি না হয়ে থাকে ত আর কয়েকটা বছর ধৈর্য ধরে থাকো—আপনিই এর সমাপ্তি হবে, কোন চিন্তা নেই।"

•

এবার শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী ও তাঁদের দাম্পত্য-জীবনের সুখ দুঃখের কথা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা যাক্।

শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে আমি যা দেখেছি এবং তাঁর সম্বন্ধে আমি যা শুনেছি, তাতে জানি যে, তিনি একজন অত্যন্ত সরল স্বভাবা, নিষ্ঠাবতী ও ধর্মশীলা মহিলা ছিলেন। তিনি তাঁর জীবন ভোর পূজা-পার্বণ ও জপতপ নিয়েই ছিলেন। হিরণ্ময়ী দেবীর বয়স যখন অল্প ছিল, তখন থেকেই তাঁর জীবনে এই ধর্মভাব দেখা দেয়। বিবাহের কয়েক বছর পরে শরৎচন্দ্র তাঁর স্ত্রীর এই জপতপ ও পূজা-পার্বণের কথা উল্লেখ করে তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে রেঙ্গুন থেকে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে এক পত্রে লিখেছিলেন—"ইনি ত দিনরাত জপতপ পূজো আচ্চা নিয়েই থাকেন।"

প্রমথবাবুর ন্যায় আরও দুই একজন বিশিষ্ট বন্ধুকে লেখা শরৎচন্দ্রের কয়েকটি চিঠিপত্রে তাঁর স্ত্রীর এই ধর্মস্বভাবের কথার উল্লেখ দেখা যায়। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ পুস্তকের প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের অন্যতম সত্বাধিকারী ও তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কেও তিনি একবার কাশী থেকে এক পত্রে লিখেছিলেন—"...এখানে ভারি গরম পড়িয়াছে, আর এক মুহূর্ত মন টেকে না, এমন

হইয়াছে। কাল-ভৈরব পোষ মানিল না। চৈত্র মাসে যাওয়া যায় না। একটা ব্রত উদ্‌যাপন আছে এঁর। শ'দুই টাকা পাঠিয়ে দেবেন। একছত্র লেখা বার হয় না, একি বিশ্রী দেশ। গত ৪।৫ দিন কলম নিয়ে বসি, আর ঘণ্টা দুই চুপ করে থেকে উঠে পড়ি।"

এই চিঠিখানিতে দেখা যায় যে, কাশীতে শরৎচন্দ্রের তখন আর এক মুহূর্ত মন না টিকলেও স্ত্রীর ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যই শুধু তিনি অত অসুবিধা ভোগ করেও চৈত্র মাসটা কাশীতেই কাটিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র সকল সময়েই তাঁর স্ত্রীর এই সব কাজের জন্য অত্যন্ত আনন্দের সহিতই নিজের সময় ও অর্থ দুই-ই ব্যয় করতেন। এজন্য তিনি আদৌ কুণ্ঠাবোধ করতেন না। হিরণ্ময়ী দেবীর এই সব বার-ব্রতের ব্যয় ছাড়া, ব্রতের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে ব্রাহ্মণভোজন করানোর ব্যাপারেও শরৎচন্দ্রের উৎসাহ কম ছিল না। এ কাজের জন্য তিনি তাঁর অন্য কাজকেও পণ্ড করতে আদৌ ইতস্তত বোধ করতেন না। শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন বন্ধু বেহালার জমিদার মণীন্দ্রনাথ রায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের ৮-২-৩২ তারিখের একটি পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করলেই এই কথার সত্যতা পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন—"সরস্বতী পূজোর সময় আমার বাড়ীর বার হওয়া চলে না। আমি অন্যান্য বারে তার পরের দিন বাইরে যাই। কিন্তু এবারে শনিবারে বড় বৌয়ের একটা ব্রত প্রতিষ্ঠার বাকি বামুন খায়ানোর দিন, আমার এ কথাটা সেদিন' মনে ছিল না। তাই 'মঙ্গলবারেই যেতে পারবো ভেবেছিলাম। আমি এই মঙ্গলবারের পরের মঙ্গলবারে বেরিয়ে পড়বো অর্থাৎ ১৬ই ফেব্রুয়ারী।"

হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর ধর্মকর্মের পথে এইভাবে তাঁর স্বামীর সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়ে আপন মনে তাঁর যত খুশি বার-ব্রত করে যেতেন। হিরণ্ময়ী দেবীর এই ধর্মস্বভাব তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঠিক

তেমনিভাবেই ছিল। ছোট ছোট বার ব্রত ছাড়া বড় বড় কাজও তিনি করতেন। বহু টাকা ব্যয় করে সামতাবেড়েয় তিনি বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সামতাবেড়ের পাশে গোবিন্দপুর গ্রামের শিব-মন্দির নির্মাণের জন্য হিরণ্ময়ী দেবী হাজার টাকারও বেশী দান করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে সস্ত্রীক থাকতেন, অনুমান করা যায় যে, তখন তাঁরা সেখানে খুব সুখেই ছিলেন। স্বামী-স্ত্রীতে মাত্র থাকতেন। আর চাকর-বাকর ত থাকতই। অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা শরৎচন্দ্রের দু'একটি চিঠিতে তাঁদের তখনকার দাম্পত্য-জীবনের কিছু কিছু খবর পাওয়া যায়। একটি চিঠিতে শরৎচন্দ্র বন্ধুকে রসিকতা করে লিখেছিলেন—"সকালে আজকাল আবার আরো বিপদ—লোকের অসুখ, আমাকে নিজেই বাজারে যেতে হয়। না গেলে যিনি আছেন তিনি বলেন 'খেতে পাবে না।'......একটু আধটু লেখাপড়া জানেন বটে কিন্তু কাজে আসে না। একদিন বলেছিলাম, আমি শুয়ে শুয়ে বলে যাই, তুমি লিখে যাও—স্বীকার করে ছিলেন, কিন্তু সুবিধা হ'ল না। "বরং" লিখতে জিজ্ঞেস করেন, অনুস্বরের ঐ টানটা ফোঁটার ভেতর দিয়ে দেব, না বাহিরে দিয়ে দেব? অর্থাৎ "ং" হবে না "ঃ" হবে?"

বিয়ের সময় পর্যন্ত হিরণ্ময়ী দেবী আদৌ লেখাপড়া জানতেন না। বিয়েয় পর শরৎচন্দ্র নিজে হিরণ্ময়ী দেবীকে কিছুটা লেখাপড়া শেখান। তার ফলে তিনি সামান্য একটু আধটু লিখতে পড়তে শেখেন।

শরৎচন্দ্র প্রমথবাবুকে আর একটি পত্রে লিখেছিলেন—"একটা দাঁত (কসের) প্রায় তিন চার বছর থেকেই নড়ে। ১০।১২ দিন পূর্বে হঠাৎ তাতে যন্ত্রণা সুরু হয়ে গেল। একটু একটু নড়ে কিনা; তাই নাড়ালে একটু আরাম পাই। উনি পরামর্শ দিলেন, খুব করে নড়াও, যদি

ভিতরে বদ রক্ত থাকে ত বার হয়ে যাবে। তখন সেইভাবে তাকে ঘণ্টাখানেক বেশ নড়ানো গেল, তখন রাত্রি প্রায় বারোটা। সকাল বেলা উঠে দেখি আর হাঁ করতে পারিনে। তার পরে সে কি যন্ত্রণা! সে দিন রাত যে কি করে গেল, তা শুধু ভগবানই জানেন। পরদিন Dentist এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন—উপড়ে ফেলে দিতে হবে।—উনিও সঙ্গে গিয়েছিলেন, বললেন—ওরে বাপরে! একটি দাঁত তুললে সব ক'টি দাঁত দুদিনে ঝুর্ ঝুর্ করে পড়ে যাবে এবং বেশ একটু scientific ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন যে, দাঁতে দাঁতে ঠেকে আছে—অসময়ে তুললেই আর রক্ষে থাকবে না। সাত পাঁচ ভেবে চলে আসা গেল, তারপর জ্বর। বুঝতেই পাচ্ছ, কি কাণ্ড হচ্ছে। আর সহ্য হল না, তার পর দিন তুলে এলাম। সে যা Dentist—প্রথমে সে নড়া দাঁতের পাশে একটা ভাল দাঁত ধরে প্রায় আধ ওপড়ানো গোছ করে তুলেছিল! যত বলি ওটা না, ওটা না সাহেব, থামো থামো—সে ততই বলে সবুর কর আর একটু টানি। তখন তার সাঁড়াশি হাত দিয়ে ঠেলে দিয়ে তবে দাঁতটা রক্ষা করি। তারপর নড়া দাঁত ওপড়ানো হ'ল। ওপড়ানো ত হ'ল—কিন্তু রক্ত থামে না। Dentist বললে, বাবু, তোমার দাঁত বড় খারাপ।—কথা শোন প্রমথ! তুই শালা তুলতে জানিস নে—রক্ত পড়ার দোষ হ'ল আমার দাঁতের।"

হিরণ্ময়ী দেবী খুব স্বামী-সোহাগিনী ছিলেন। রেঙ্গুনে থাকার সময় তিনি নিজের হাতে অত্যন্ত যত্ন সহকারে পরিপাটি করে রেঁধে তাঁর স্বামীকে খাওয়াতেন। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে দেশে ফিরে যখন হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকতেন, তখনও অনেকদিন পর্যন্ত রান্নাবান্নার যাবতীয় কাজকর্ম হিরণ্ময়ী দেবী নিজের হাতেই করতেন। তারপর শরৎচন্দ্রের

আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে, শরৎচন্দ্র স্ত্রীর পরিশ্রম লাঘবের জন্য রাঁধবার লোকের ব্যবস্থা করলেও হিরণ্ময়ী দেবী অনেক সময় নিজেই রাঁধতেন, তা ছাড়া সবসময়ই তিনি তাঁর স্বামীর খাওয়ার দিকে নজর রাখতেন। এ ছাড়া তিনি প্রায় এটা ওটা ভাল খাদ্য ঘরে তৈরী করে তাঁর স্বামীকে খাওয়াতেন। এদিকে শরৎচন্দ্র কিন্তু আদৌ ভোজন-বিলাসী ছিলেন না। অধিকন্তু তিনি ছিলেন অল্পাহারী। হিরণ্ময়ী দেবী তবুও ছাড়তেন না। তিনি কাছে বসে অনুরোধ উপরোধ করে তাঁর স্বামীকে খাওয়ানোর চেষ্টা করতেন। স্ত্রীর এই খাওয়ানোর জুলুমের কথা নিয়ে রসিকতা করে শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য-শিষ্যা লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে একবার এক পত্রে লিখেছিলেন—"কোন কালে আমি অম্বলের রুগী নই। এত কম খাই যে, অম্বল পর্যন্ত আমার কাছে ঘেঁসে না, পাছে তাকেও বা অনাহারে শুকিয়ে মরতে হয়। কি যে সেদিন জোর করে ছাই পাঁশ কতকগুলো ঘরের তৈরী করা সন্দেশ খাইয়ে দিলে—আজও যেন তার ঢেঁকুর উঠ্ছে। আমি এ-দেশের একটি বিখ্যাত কুঁড়ে। চিবোবার ভয়ে কোন জিনিস সহজে মুখে দিতে চাই নে—আমার ধাতে ও-অত্যাচার সইবে কেন? কি বল দিদি, ঠিক না? কিন্তু বাড়ীর লোকে বোঝে না, তারা ভাবে আমি কেবল না খেয়ে খেয়েই রোগা। সুতরাং খেলেই বেশ ওদেরই মত হাতী হয়ে উঠব। স্বর্গীয় গিরিশবাবু তাঁর আবুহোসেনে লাখ কথার একটা কথা বলে গিয়েছেন যে, 'অবলার বড় নোলা, তারা মলেও খায়।' মেয়েমানুষ জাতটাকে তিনি চিনেছিলেন। আজ বিশ বছর আমরা কেবল খাওয়া নিয়েই লাঠালাঠি করে আসছি। ঐ খেলে না, খেলে না—রোগা হয়ে গেল—ঘর-সংসার রান্না-বান্না কিসের জন্য—যেখানে দুচোখ যায় বিবাগী হয়ে যাবো—ইত্যাদি কত কি! আমি বলি, ওরে বাপু, বিবাগী হবে ত শীগ্‌গীর হও,—এ যে শুধু আমাকে ভয় দেখিয়ে দেখিয়েই কাঁটা করে তুললে!

বাস্তবিক আমার দুঃখটা আর কেউ দেখলে না দিদি! আমি প্রায় ভাবি, সত্যিকার স্বর্গ যদি কোথাও থাকে ত সেখানে বোধ হয় এমন একজন আর একজনকে খাবার জন্য জবরদস্তি করে না। আর তা যদি হয় ত—আমি যেন বরঞ্চ নরকেই যাই।”

হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর স্বামীর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কিরূপ যত্ন করতেন, এ চিঠিখানি তার একটি প্রধান সাক্ষ্য।

হিরণ্ময়ী দেবী অশিক্ষিতা, গ্রাম্য ও সরলস্বভাবা ছিলেন। হিরণ্ময়ী দেবী অত্যন্ত স্বামী সেবাপরায়ণা হলেও অতবড় একজন প্রতিভাধর সাহিত্যিকের যোগ্য সহধর্মিণী যে হতে পারেন নি, একথা বলা যেতে পারে। তবুও এই হিরণ্ময়ী দেবীর উপরই নারী-দরদী শরৎচন্দ্রের ভালবাসা অত্যন্ত গভীর ছিল।

হিরণ্ময়ী দেবীর পেটে যখন প্রথম টিউমার দেখা দেয়, তখন ডাক্তার দেখে অপারেশন করবার উপদেশ দেন এবং এ কথাও বলেন যে, অপারেশন না করলে, এই টিউমার দিনে দিনে বেড়ে যেতে থাকবে।

অপারেশন করাতে গিয়ে পাছে হিরণ্ময়ী দেবীকে হারাতে হয়, এই ভয়ে শরৎচন্দ্র কিছুতেই অপারেশন করতে দিলেন না। হিরণ্ময়ী দেবীর পেটের সেই টিউমার পরে বৃহদাকার ধারণ করে এবং এমন হয় যে, আর অপারেশনের কথাই উঠত না।

হিরণ্ময়ী দেবীর অসুখ বিসুখ করলেই শরৎচন্দ্র অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়তেন। সামতাবেড়ে থাকার সময় হিরণ্ময়ী দেবী একবার নিউমনিয়ায় আক্রান্ত হলে শরৎচন্দ্র কিরূপ কাতর হয়ে পড়েছিলেন, সে সম্বন্ধে মণীন্দ্র নাথ রায় লিখেছেন—“…কতদিনের কথা, তবুও যেন কত না আমার মনে রয়েছে। হঠাৎ একদিন দাদার একখানা চিঠি পেলাম—লিখেছেন, ‘মণি, বড়বৌয়ের খুব অসুখ, এ যাত্রায় বাঁচবেন কিনা জানি না—পারতো একবার এসো।’ চিঠি পড়ে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো, তখনই

ছুটে গেলাম। দেউলটিতে নেমে সামতাবেড়ে যখন পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হতে চলেছে···দেখলাম, দাদার বাড়ীর একদিকের একতলার নীচের একটি লম্বা খোলা দালানে একখানি ইজিচেয়ারে দাদা শুয়ে আছেন—বাঁদিকের লম্বা হাতলে বাঁ পায়ের উপর ডান পাটি দিয়ে। পাশেই গড়গড়াতে সাজা তামাক, হাতে নল, কিন্তু টানছেন না। বোধ হলো চোখ বুজেই আছেন···একটি হ্যারিকেন আলো খানিকটা দূরে টিম্‌টিম্ করে জ্বলছে। আস্তে আস্তে গিয়ে দাদার পায়ের ধূলো নিতেই তাঁর সম্বিত ফিরে এলো—বুঝলাম এবার যে সত্যিই তিনি চোখ বুজিয়ে ভাবনার রাজ্যে গিয়েছিলেন। পাশেই একটি ছোট বেতের মোড়া ছিল, বসলাম। বললেন, 'মণি, তুমি আজই যে আসবে তা আমি আশা করিনি—তবে আমার চিঠি পেয়ে যে তুমি নিশ্চয়ই আসবে, এটা আমি সুনিশ্চিত করেই জানতাম। চলো উপরে। খুব করুণভাবেই বললেন, 'বড় বৌয়ের খুব বাড়াবাড়ি মণি, ডবল নিউমোনিয়া—বোধ করি এবার আর তাঁকে ধরে রাখতে পারলাম না। বুকে পিঠে সর্দি বসে গেছে, জ্বরও খুব বেশী—অচেতন অবস্থাতেই রয়েছেন। এখানকার ডাক্তার দেখছেন।' দেখলাম, দাদার দু'চোখ জলে ভরে গিয়েছে, কথাগুলিও যেন ভারী ভারী।"

হিরণ্ময়ী দেবীর অসুখে শরৎচন্দ্র যেমন কাতর হতেন, অপরপক্ষে শরৎচন্দ্রের বেলায় হিরণ্ময়ী দেবীর অবস্থাও ঐ রকমই হ'ত। হিরণ্ময়ী দেবী অত্যন্ত ধর্ম্মস্বভাবা বলে তাঁর স্বামীর অসুখ করলে তিনি অনেক সময় তাঁর স্বামীর রোগ মুক্তির জন্য ঠাকুর দেবতার কাছে মানত করতেন। রেঙ্গুনে তাঁরা যেখানে থাকতেন, সেখানকার বাঙ্গালী পল্লীতে শীতলা দেবীর কাছে একবার এবং পরে কলকাতার কালীঘাটের কালীর কাছে আর একবার হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর স্বামীর রোগমুক্তি কামনা করে পাঁঠা মানত করেছিলেন। শরৎচন্দ্র পাঁঠা মানতের কথা দুবারই

জানতে পেরে, জীব জন্তুর প্রতি মমতা বশতঃ তিনি দেবীর কাছে পাঁঠার মূল্য ধরে দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র ফোলা, অর্শ, আমাশয়, জ্বর, একটা না একটা অসুখে প্রায়ই ভুগতেন। ডাক্তার সব সময়ে থাকলেও হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর স্বামীকে সুস্থ করবার জন্য এর ওর কাছে শুনে কখন কখন নিজে টোটকা চিকিৎসাও করতেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর দুঃস্থ প্রতিবেশীদের অসুখ করলে নিজে তাদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন, এমন কি প্রয়োজন হলে কারও কারও পথ্য পর্যন্তও নিজে কিনে দিতেন। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর এই গরীব প্রতিবেশীদের অসুখে ডাক্তার এলে অনেক সময় হিরণ্ময়ী দেবীই তাদের বাড়ীতে গিয়ে ডাক্তারের ফি দিয়ে আসতেন এবং রোগীকে ভাল করে দেখবার জন্য ডাক্তারকে অনুরোধ করতেন। এছাড়া হিরণ্ময়ী দেবীর আরও কিছু কিছু দানধ্যানও ছিল।

এই আত্মপ্রচারের যুগে হিরণ্ময়ী দেবী আদৌ আত্মপ্রচারের চেষ্টা করেন নি। তিনি যা করতেন নিজের মনে ও নিজের খেয়ালেই করতেন। কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে অনেকে সামতাবেড়ের শরৎচন্দ্রের বাড়ী ও হিরণ্ময়ী দেবীকে দেখতে যেতেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর দর্শনার্থীদের দেখা দিতেন না। আমি একদিন হিরণ্ময়ী দেবীর কাছে গিয়েছিলাম। যেতেই তিনি বললেন যে, কিছু আগেই কলকাতা থেকে একদল লোক তাঁর বাড়ীতে এসেছিল, তাঁরা শুধু তাঁকে একবার দেখতে চাইলেন, এবং দেখে তাঁর পায়ের ধুলো নিতে চাইলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই তাঁদের দেখা দিলেন না। তাঁর এই ব্যাপারে তারা চলে যাবার সময় তাঁকে অভদ্র ইত্যাদি বলে গেলেন।

হিরণ্ময়ী দেবী আত্মপ্রচারে এতখানি বিমুখ ছিলেন যে, তাঁর একটি

ফটো তুলতে দিতেও তিনি নারাজ ছিলেন। হিরণ্ময়ী দেবীর একটাও ফটো নেই। এই ফটোর কথায় মণীন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন—"জিজ্ঞাসা করলাম, বৌদি, দাদার তো অনেক ছবি আমার কাছে আছে। আপনার ছবি থাকে তো একখানা দিন আমায়, কোথাও তো আপনার ছবি দেখিনি। বৌদিদি একটু হাসলেন, বললেন, মণি, আমার কোন ছবি নেই। তোমার দাদা একবার রেঙ্গুনে একখানা ছবি তোলবার সব ঠিক করেছিলেন—সব ঠিক। ছবিওয়ালাও এসেছেন—ছবি তুলতে তোমার দাদা চেয়ারে বসে, আমি তাঁর ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে। এমন সময় হঠাৎ আমার পেটে ব্যথা ধরলো, বোধ হয় অম্বলের ব্যথা—আর ছবি তোলা হোলো না ভাই।" সেই অবধি আর কোনো ছবি তোলবার চেষ্টা হয় নি। পরে অবশ্য আমরা ছবি তুলতে চাইলে তিনি আর ছবি তোলাতে চান না।

হিরণ্ময়ী দেবীর কোন সন্তান হয়নি। শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশবাবুর কন্যা মুকুলমালা এবং পুত্র অমলকুমারকে শরৎচন্দ্র ও হিরণ্ময়ী দেবী নিজের পুত্র কন্যার ন্যায়ই আদর-যত্ন ও স্নেহ করতেন। শরৎচন্দ্র তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশবাবুর বিয়ে দিয়ে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধুকে নিজের কাছেই রেখেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের পরিবারে তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী, ছোটভাই প্রকাশ-বাবু, প্রকাশবাবুর স্ত্রী এবং প্রকাশবাবুর পুত্র কন্যা—এই ছোট্ট পরিবারের মধ্যে শরৎচন্দ্র খুব শান্তিতেই দিন কাটাতেন। বাড়ীর প্রত্যেকের সুখ সুবিধার দিকে তিনি সবসময়েই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি অসুখে পড়লে, পাছে কোথাও কারো কিছু অসুবিধা হচ্ছে, এই ভেবে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়তেন। মৃত্যুর আগের বছর শরৎচন্দ্র যখন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দেওঘর যান, তখন তিনি ঘন ঘন চিঠিতে বাড়ীর খবর পাবার জন্য তাঁর ভাগ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে একখানি

বড় করুণ চিঠি লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—"হোঁদল, আজ দশ দিনের মধ্যে বাড়ীর খবর কেবল একখানা চিঠিতে পেয়েছি। অসুস্থ দেহে সকলের জন্যে বড় চিন্তা হয়। তোমার মামীমা তো চিঠি লিখতে জানেন না, সুতরাং তোমরা অনুগ্রহ করে যদি প্রত্যহ না হোক ২।১ দিন পরে পরেও এক আধটা পোষ্টকার্ড দাও ত কতকটা নিশ্চিন্ত হই।"

অতবড় সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের স্ত্রী চিঠি পর্যন্ত লিখতে জানতেন না। অসুস্থ দেহে দূর দেশে থেকে বাড়ীর সংবাদ-সহ স্ত্রীর একখানি পত্র পেলে শরৎচন্দ্র তখন কতই না শান্তি পেতেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী চিঠি লিখতে জানতেন না বলে, তাঁর ও বাড়ীর অন্যান্য সকলের সংবাদ নিয়ে প্রত্যহ একখানি করে চিঠি লিখবার জন্য তিনি অন্যকে অনুরোধ করেছিলেন।

হিরণ্ময়ী দেবী তো শরৎচন্দ্রকে চিঠি লিখতে পারতেন না। আর শরৎচন্দ্রও হিরণ্ময়ী দেবী পড়তে পারবেন না বলে এবং চিঠির উত্তর দিতে পারবেন না বলে তাঁকে কখনো চিঠি লেখেন নি। মণীন্দ্রনাথ রায় একবার পরিহাস করে হিরণ্ময়ী দেবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শরৎচন্দ্র তাঁকে কখনো চিঠি পত্র লিখেছিলেন কিনা? এ সম্পর্কে মণিবাবু নিজে যা লিখেছেন, এখানে তাই উদ্ধৃত করছি—"হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, বৌদি, দাদা আপনাকে চিঠি পত্তর লিখতেন? মুখখানি একটু ঘুরিয়ে বললেন—তোমার দাদা তো ভাই আমাকে ছেড়ে বড় একটা বেশী দিন থাকতেন না। তাছাড়া আমি মুখ্যু মানুষ, লেখাপড়া তো জানি না। শুধু নামটাই লিখতে পারি—না, চিঠি কখনও লেখেন নি।"

মৃত্যুর সময় শরৎচন্দ্র তাঁর স্ত্রীকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করে উইল করে দিয়ে গেছেন। তবে উইলে তিনি এ কথাও লিখে

গেছেন যে, তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীর মৃত্যু হলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অমলকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন।

"ভারতবর্ষ" পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের বিবাহ-প্রসঙ্গ নামে একটি প্রবন্ধ লিখবার সময় একদিন সামতাবেড়েয় আমি হিরণ্ময়ী দেবীকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। আমি যখন যাই, তার কিছু আগেই শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরে অবস্থান-কালের জনৈক বন্ধু হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। যাবার সময় তিনি তাঁর বৌদি হিরণ্ময়ী দেবীর জন্য কিছু কমলা লেবু নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে কথা কয়ে চলে আসবার সময় দেখলাম, তিনি সেখানে উপস্থিত কয়েকজনকে সেই কমলা লেবুগুলো নিয়ে যেতে বলছেন এবং আরও বলছেন যে, তিনি কমলা লেবু খান না।

হিরণ্ময়ী দেবী কমলা লেবু কেন খান না, কৌতূহল বশে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করতে জানলাম যে, শরৎচন্দ্র পার্ক নার্সিং হোমে মৃত্যুর পূর্বে কমলা লেবুর রস খেতে চেয়ে খেতে পান নি বলে, শুধু হিরণ্ময়ী দেবীই নন, শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশবাবুও কমলা লেবু খেতেন না। এই কারণেই প্রকাশবাবুর স্ত্রীও কমলা লেবু আর খান না।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যু তারিখ ২রা মাঘ। বছরের এই দিনটিকে হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর স্বামীর মৃত্যু দিন বলে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করতেন। এই দিনটি তিনি তাঁর স্বামীর ধ্যান ধারণা করে এবং নিরম্বু উপবাস করে কাটাতেন। আর প্রতি বছর এই ২রা মাঘ তারিখে অথবা এর পরের একটা রবিবারে হিরণ্ময়ী দেবী বহু টাকা খরচ করে সামতাবেড়েয় তাঁর গ্রামের বাড়ীতে বালক ভোজন করাতেন।

উপসংহারে এই হিরণ্ময়ী দেবী সম্বন্ধে আমার একটি কথা বলার এই যে, শরৎচন্দ্র তাঁর প্রথম যৌবনে অল্পদিন-স্থায়ী সাহিত্য-সাধনার

পর দীর্ঘদিন যখন সাহিত্য ক্ষেত্র থেকে দূরে ছিলেন এবং আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূর প্রবাসে যখন ছন্দহীন জীবন যাপন করছিলেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁর জীবনে হিরণ্ময়ী দেবী যদি এসে না দেখা দিতেন, তাহলে সেদিনের সেই শরৎচন্দ্র আজকের শরৎচন্দ্র হতে পারতেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। হিরণ্ময়ী দেবী অশিক্ষিতা, গ্রাম্য, সরলা ও অনেক বিষয়ে অবুঝ ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর মত স্বামী-সেবাপরায়ণা, ধর্মশীলা, কর্তব্যনিষ্ঠাবতী, কোমলহৃদয়া, অহংকার ও অভিমানশূন্যা মহিলা এ যুগে খুব কমই আছেন। তিনি তাঁর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেমের বাঁধনে ভবঘুরে শরৎচন্দ্রকে সংসারে আবদ্ধ করতে পেরেছিলেন বলেই, পরে শরৎচন্দ্রের জীবনে সাহিত্য সাধনার পথ সহজ ও সুগম হয়েছিল। তাই শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনে হিরণ্ময়ী দেবীর দানই বোধ করি সবার উচ্চে। কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থটি হিরণ্ময়ী দেবীকে উৎসর্গ করতে গিয়ে ঠিকই বলেছেন—"বৌদি, যৌবনের প্রথম উষায় যে গৃহ-বিরাগী আত্মভোলা উদাসী মানুষটি একদিন সকল বন্ধন ছিঁড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন, ব্যর্থতার নিবিড় বেদনা যাঁকে বাঞ্ছিত সাহিত্য-সাধনা হতে সুদীর্ঘকাল নিবৃত্ত রেখেছিল, দেশ-দেশান্তরে নিরুদ্দেশে ঘুরিয়ে নিয়ে চলেছিল ভবঘুরের মতো—সেদিনের সেই গৃহত্যাগী শ্মশানচারী শিবকে প্রমথ সঙ্গীদলের আবেষ্টন থেকে সংসারে ফিরিয়ে এনেছিল আপনারই অপরিসীম ভক্তি ও প্রেমের সুকঠোর তপস্যা।"

রাজলক্ষ্মী

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের অনেকেই এই উপন্যাসের নায়ক শ্রীকান্তকে স্বয়ং শরৎচন্দ্র ভেবে থাকেন। আর সেই সূত্রে তাঁরা শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রণয়-কাহিনীটিকে রাজলক্ষ্মীর সহিত শরৎচন্দ্রের নিজেরই প্রণয়-কাহিনী বলে মনে করেন।

এঁদের অনেকে আবার শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকেই সেই রাজলক্ষ্মী বলেই মনে করেন। এমন কি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন, তাঁদেরও কেউ কেউ এ কথা বিশ্বাস করেন। সেই জন্যই শরৎচন্দ্রের কোন কোন বন্ধু তাঁকে প্রশ্নও করতেন—তাহলে হিরণ্ময়ী দেবীই কি রাজলক্ষ্মী ?

শরৎচন্দ্র অনেক সময়েই বন্ধুদের এই প্রশ্নের কোনরূপ জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকতেন। আবার কখনো কখনো বা বিরক্ত হয়ে তাঁদের কথা সমর্থন করে বলতেন—হ্যাঁ, ইনিই সেই রাজলক্ষ্মী। ছাড়লেন না, তাই শেষ পর্যন্ত শৈবমতে বিয়ে করতে হল।

তাঁরাই শরৎচন্দ্রের এই কথাকে বিশ্বাস করে বাইরে এসে প্রচার করতেন—ঐ হিরণ্ময়ী দেবীই রাজলক্ষ্মী।

শরৎচন্দ্রের এক স্নেহভাজন বন্ধু শ্রীশৈলেশ বিশী তাঁর "বিপ্লবী শরৎ-চন্দ্রের জীবনপ্রশ্ন' গ্রন্থে হিরণ্ময়ী দেবীকেই তাই রাজলক্ষ্মী বিশ্বাস করে লিখেছেন—"এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই রাজলক্ষ্মী কে ? তাঁর বিবাহিত স্ত্রী—লক্ষ্মী বলেই যাঁকে তিনি আদর করে ডাকতেন।......তিনি তাঁকে বিয়ে করেছিলেন, শৈবমতে। যেদিন সেই কথা তাঁর মুখে শুনলাম, আমার সব অমৃতের সন্ধান বিষিয়ে গেল, নিজের অলক্ষ্যে চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে ক'ফোঁটা জল ঝরে পড়ল। আমি স্পষ্টই বললুম—এত

ভালবাসাকে আপনি বিয়ে করে অমর্যাদা করলেন। যেটা ছিল স্রোতের জল, স্বচ্ছ পুণ্যতোয়া ভাগীরথী, আজ সেটাকে বাঁধ দিয়ে করলেন পুকুর, খানা, ডোবা! তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন —এ ছাড়া উপায় ছিল না, তাছাড়া ও ছাড়ল না।" (পৃঃ ৯১—৯২)

রাজলক্ষ্মী যে কে, শরৎচন্দ্রকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে, তিনি কাউকে কাউকে আবার একথাও বলতেন যে, ও সব স্রেফ কল্পনা। যেমন লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায় নাম্নী জনৈকা মহিলা লেখিকার এরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে শরৎচন্দ্র তাঁকে লিখেছিলেন—"রাজলক্ষ্মীকে কোথায় পাবে? ও সব বানান মিছে গল্প। শ্রীকান্ত উপন্যাস বইত নয়। ও সব মিছে জনরবে কান দিতে নেই।"

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর হিরণ্ময়ী দেবী ২৩ বৎসর বেঁচেছিলেন। ঐ সময়টা তিনি সাধারণতঃ শরৎচন্দ্রের হাওড়া জেলার সামতাবেড়ের বাড়ীতেই থাকতেন। শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে তাঁর বন্ধুরা যেমন তাঁকে, হিরণ্ময়ী দেবীই রাজলক্ষ্মী কিনা জিজ্ঞাসা করতেন, শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও লোকে তেমনি সামতাবেড়েয় বেড়াতে গিয়ে হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকেও প্রশ্ন করতেন—আপনিই কি রাজলক্ষ্মী?

লোকের অনবরত এই একই প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে, হিরণ্ময়ী দেবী শেষ দিকে আর কোন আগন্তুকের সঙ্গে সহজে দেখাই করতেন না। কলকাতা কি অন্য কোনখান থেকে লোক এসেছে শুনলেই তিনি দোতলায় উঠে জানালা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতেন। শত ডাকা-ডাকিতেও নামতেন না।

হিরণ্ময়ী দেবীকে যাঁরা দেখেছেন বা তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেছেন—তাঁরা সকলেই জানেন যে, এই হিরণ্ময়ী দেবী কখনও রাজ-লক্ষ্মী হতে পারেন না। আমি নিজে অন্ততঃ বার দশেক সামতাবেড়েয়

হিরণ্ময়ী দেবীর নিকটে গেছি এবং তাঁর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথাবার্তাও বলেছি। আমার সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি যে, হিরণ্ময়ী দেবী একজন অত্যন্ত সাধারণ, গ্রাম্য সরলা মহিলা ছিলেন। গুছিয়ে ভাল করে কথা বলতেও তিনি পারতেন না। অথচ রাজলক্ষ্মী নাচে, গানে যেমন ওস্তাদ, কথাবার্তায়ও তেমনি কি চৌকস! রূপ, গুণ এবং বুদ্ধিতে হিরণ্ময়ী দেবী রাজলক্ষ্মীর আদৌ সমকক্ষ ছিলেন না।

অতএব হিরণ্ময়ী দেবী যে রাজলক্ষ্মী নন, এ কথা জোর করেই বলা যেতে পারে। শ্রীকান্ত উপন্যাসে লেখক, শ্রীকান্তের কাহিনী নিজের জবানীতে বিবৃত করেছেন। প্রধানতঃ সেই কারণেই অনেকে শরৎ-চন্দ্রকে শ্রীকান্ত ভেবে থাকেন। দ্বিতীয়তঃ শরৎচন্দ্রের ছন্নছাড়া জীবনের সঙ্গে শ্রীকান্তের জীবনের অনেকটা মিল পাওয়া যায়। শ্রীকান্তকে শরৎচন্দ্র ভাবা এও একটা কারণ। যাই হোক্, রাজলক্ষ্মী সম্বন্ধে আলোচনা করবার পূর্বে প্রথমে শ্রীকান্তই শরৎচন্দ্র কিনা এবং শ্রীকান্তের কাহিনীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের জীবনের কতটা মিল আছে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক :—

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটি ১৩২২ সালের মাঘ মাস থেকে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু হয়। তখন লেখাটি "শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী" নামে ছাপা হ'ত এবং লেখকের নাম হিসাবে থাকত "শ্রীশ্রীকান্ত শর্মা"।

ঐ সময় শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ভারতবর্ষ পত্রিকার সত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে এক পত্রে লিখেছিলেন—

"শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী যে সত্যই 'ভারতবর্ষে' ছাপিবার যোগ্য আমি তাহা মনে করি নাই—এখনও করি না। তবে যদি কোথাও কেহ ছাপান এই মনে করিয়াছিলাম। বিশেষ তাহাতে গোড়াতেই যে সকল শ্লেষ ছিল, সে সকল যে কোন মতেই আপনার কাগজে

স্থান পাইতে পারে না, সে ত জানা কথা তবে অপর কোন কাগজের হয়ত সে আপত্তি না থাকিতেও পারে, এই ভরসা করিয়াছিলাম। সেই জন্যই আপনার মারফতে পাঠানো।

যদি বলেন তো আরো লিখি, আরো অনেক কথা বলিবার রহিয়াছে। তবে ব্যক্তিগত শ্লেষ-বিদ্রূপ ঐ পর্যন্তই। তবে শেষ পর্যন্ত সব কথাই সত্য বলা হইবে।

আমার নামটা কোন মতেই প্রকাশ না পায়। এমন কি আপনি ছাড়া, উপেনবাবু ছাড়া (তাঁর মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না—তা ভালই হোক, মন্দই হোক) আর কেহ না জানে ত বেশ হয়। ওটা কি? অবশ্য শ্রীকান্তর আত্মকাহিনীর সঙ্গে কতকটা সম্বন্ধ ত থাকিবেই, তাছাড়া ওটা ভ্রমণই বটে। তবে 'আমি' 'আমি' নেই। অমুখের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করিয়াছি, অমুকের গা ঘেঁসিয়া বসিয়াছি—এ সব নেই। বাস্তবিক 'তিন মাস' যে ত্রিশ বচ্ছরের ধাক্কা লইবার উপক্রম করিল। অথচ কি নীরস! কি কটু! আপনি দুঃখিত হবেন না—এইটা শুধু আমার নয়, অনেকেরই মত। মহারাজের ওটায় ত এর শতভাগের একভাগও আত্মম্ভরিতা নেই। তাতে 'আমি'ও যেমন আছে, 'তুমি'ও তেমনি আছে—ওরা তারাও বাদ যায় নাই। রবিবাবু নিজের আত্ম-কাহিনী লিখিয়াছেন, কিন্তু নিজেকে কেমন করিয়াই না সকলের পিছনে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যাহারা লিখিতে জানে না, অর্থাৎ যাহাদের লেখার পরখ হয় নাই, তা তাহারা যত বড় লোকই হোক, না জানিয়া তাহাদের দীর্ঘ লেখা ছাপিবার অনেক দুঃখ। ইহারা মনে করে সব কথাই বুঝি বলা চাই-ই। যা দেখে, যা শোনে, যা হয়, মনে করে সমস্তই দেখানো শুনানো দরকার। যারা ছবি আঁকিতে জানে না, তারা যেমন তুলি হাতে করিয়া মনে করে যা চোখের সামনে দেখি সবই আঁকিয়া ফেলি। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সে-ই

শেষে টের পায়, না তা নয়। অনেক বড় জিনিষ বাদ দিতে হয়, অনেক বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে হয়—তবে ছবি হয়। বলা বা আঁকার চেয়ে না-বলা, না-আঁকা ঢের শক্ত। অনেক আত্ম-সংযম, অনেক লোভ দমন করিতে হয়, তবেই সত্যিকারের বলা এবং আঁকা হয়।"

এখানে উদ্ধৃত পত্রাংশটির মধ্যে যে, তিন মাস ত্রিশ বচ্ছরের ধাক্কার কথা আছে, সেটি হচ্ছে, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর 'য়ুরোপে তিন মাস' প্রবন্ধের কথা। ঐ প্রবন্ধটি তখন 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হচ্ছিল। তিন মাসের ভ্রমণ কাহিনী বহু মাস ধরে প্রকাশিত হচ্ছিল বলেই শরৎচন্দ্র ঐরূপ মন্তব্য করেছিলেন। আর পত্রাংশটির মধ্যে "মহারাজের ওটা"র যে কথা আছে, তা হচ্ছে—বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহাতাবের 'আমার য়ুরোপ ভ্রমণের' কথা। মহারাজের এই ভ্রমণ কাহিনীটিও তখন ধরাবাহিকভাবে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হচ্ছিল।

'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' ১৩২২ সালের মাঘ থেকে ১৩২৩ সালের মাঘ পর্যন্ত 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হ'লে, ঐ ১৩২৩ সালের মাঘ মাসেই শ্রীকান্ত ১ম পর্ব পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' শ্রীকান্ত নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার সময়, গ্রন্থে, 'ভারতবর্ষে' প্রথম বারের প্রকাশিত অংশটার কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়। ঐ অংশেই কিছু ব্যক্তিগত শ্লেষ-বিদ্রূপ ছিল।

শরৎচন্দ্র হরিদাসবাবুকে লিখেছিলেন—ব্যক্তিগত শ্লেষ-বিদ্রূপ ঐ পর্যন্তই, তবে শেষ পর্যন্ত সব কথাই সত্য বলা হইবে।

শরৎচন্দ্র হরিদাসবাবুকে আরও লিখেছিলেন—অবশ্য শ্রীকান্তের আত্মকাহিনীর সঙ্গে কিছুটা সম্বন্ধ ত থাকিবেই।

আর একটা কথা, শরৎচন্দ্র হরিদাসবাবুকে লেখা পত্রে দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, বর্ধমানের মহারাজা ও রবীন্দ্রনাথের আত্মকাহিনী নিয়ে

যেভাবে আলোচনা করেছেন এবং ঐ পত্রেই আত্মকাহিনী বলতে গেলে, অনেক আত্মসংযম, অনেক লোভ দমন করার, যে কথা বলেছেন, তাতে শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনীতেও যে তিনি তাঁর আত্মকাহিনীই বলবেন, তারও একটা পরিষ্কার আভাষ পাওয়া যায়।

আমাদের সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, শ্রীকান্ত আসলে একটি উপন্যাস এবং উপন্যাস লিখতে গিয়ে লেখক সত্য ঘটনার উপর কল্পনার তুলি বুলিয়ে তাকে সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করে তুলেছেন, এ কথা মনে রেখেই এখন শ্রীকান্তে বাস্তব চরিত্র বা ঘটনা কিছু আছে কিনা, দেখা যাক্—

প্রথমেই দেখা যায় যে, শ্রীকান্ত উপন্যাস গোড়াতেই যাকে নিয়ে আরম্ভ সেই ইন্দ্রনাথ একটি বাস্তব চরিত্র। ইন্দ্রনাথের আসল নাম রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার। ইনি ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরের বাল্যবন্ধু ও মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একদিন আমায় বলেছিলেন—শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তে রাজেন্দ্র বা রাজুকে ইন্দ্রনাথ-রূপে চিত্রিত করতে গিয়ে, আদৌ অতি রঞ্জিত করেন নি। আমি দেখেছি, বাস্তবিক রাজু ঐ প্রকৃতিরই মানুষ ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান দেবানন্দপুর গ্রামের দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তমুন্সী বি-এল মহাশয় শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর-বৎসর (১৩৪৫ সাল) আনন্দবাজার পত্রিকায় "দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবন" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি শরৎচন্দ্রের দেবানন্দপুরের বাল্যবন্ধু ও সহপাঠিদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ঐ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। ঐ প্রবন্ধে দ্বিজেনবাবু কিন্তু লেখেন—দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের বাংলা ছাত্রবৃত্তি স্কুলের শিক্ষক সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সতীশচন্দ্র ভট্টচার্যকে দেখে শরৎচন্দ্র ইন্দ্রনাথ চরিত্র কল্পনা করেছেন। সতীশচন্দ্র

শরৎচন্দ্র অপেক্ষা ২।৩ বৎসরের বড় হলেও বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। সতীশচন্দ্র শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথের ন্যায় ঐ ধরণেরই মানুষ ছিলেন।

দ্বিজেনবাবু শেষে অবশ্য বলেছেন—রাজু এবং সতীশ দুজনের চরিত্র একসঙ্গে মিশিয়ে ইন্দ্রনাথ আঁকাও শরৎচন্দ্রের পক্ষে অসম্ভব নয়।

শ্রীকান্ত উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের নিজের কাহিনী কতটা আছে, সে সম্বন্ধে কবি কালিদাস রায় একবার শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন।

উত্তরে শরৎচন্দ্র সেদিন কালিদাসবাবুকে বলেছিলেন—তা কিছু আছে বৈকি! তবে উপন্যাসে বর্ণিত কোন একটা সময়ের ঘটনাই যে, আমারও জীবনের সেই একটা সময়েরই ঘটনা তা নয়; জীবনের বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা খণ্ড খণ্ড অনেক ঘটনাকেই, লিখবার সময় এক সময়ের একটি সম্পূর্ণ ঘটনা করে লিখেছি। কোন কাহিনী বা ঘটনাকে সাহিত্যের পর্যায়ে আনতে হলে, তাকে হয় কল্পনা দিয়ে, নয়ত অন্যান্য খণ্ড খণ্ড ঘটনা বা কাহিনী দিয়ে পূরণ করে; সম্পূর্ণ করে তুলতে হয়। তোমাকে দিয়েই একটা উদাহরণ দিচ্ছি:—তুমি শিক্ষকতা করছ। ধর, তুমি একটি ছেলেকে তার নিজের গ্রাম সম্বন্ধে একটি রচনা লিখতে দিলে। মনে কর, ছেলেটির গ্রামে লিখবার মত উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। গ্রামে নদী নেই, এমন কি একটি দেবমন্দির পর্যন্ত নেই। ছেলেটিকে এখন রচনায় নম্বর পেতে হলে, তার আশ-পাশের গ্রামে দেখা নদী, দেবমন্দির প্রভৃতির কথাও তার নিজের গ্রামের সঙ্গে খাপ খাইয়ে লিখতে হবে। তবেই ত তুমি তাকে নম্বর দেবে, নাকি? সাহিত্যের বেলায়ও তাই। একটা পূর্ণাঙ্গ কাহিনী বা চরিত্র সৃষ্টি করতে হলে, ঐরূপই করতে হয়।

কালিদাসবাবুর প্রশ্নের উত্তরে শরৎচন্দ্রের এই কথাগুলি থেকে এখন বলা যেতে পারে যে, ইন্দ্রনাথ চরিত্র পরিপূর্ণভাবে চিত্রিত

করতে গিয়ে রাজুর চরিত্রের সঙ্গে আর এক বাল্যবন্ধু সতীশচন্দ্রের জীবনের কাহিনী কিছু জুড়ে দেওয়া, এমন কিছুই বিচিত্র নয়।

শ্রীকান্তের অন্নদাদিদিও একটি বাস্তব চরিত্র। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একদিন আমাকে বলেছিলেন, তিনি শরৎচন্দ্রের মুখে গল্প শুনেছিলেন, অন্নদাদিদি নাকি সত্যই ছিলেন।

অন্নদাদিদি সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তমুন্সী লিখেছেন—"শ্রীকান্ত উপন্যাসে প্রথম পর্বের যে অন্নদাদিদি ও শাহজী নামক তাঁহার সাপুড়ে স্বামীর কাহিনী আছে, তাহাও দেবানন্দপুর গ্রামের প্রান্তবর্তী সরস্বতী নদীর অপর পারের 'মালিস্‌পুর' গ্রামের তখনকার দিনের একটি সত্য ঘটনা। শরৎচন্দ্র এবং সতীশচন্দ্র প্রায়ই এই অন্নদাদিদির কুটীরে যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহাকে ফল, তরকারী, মাছ মাঝে মাঝে দিয়া আসিতেন ও সময়ে সময়ে সামান্য অর্থ সাহায্যও করিতেন—একথা শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু শ্রীকান্ত উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে উল্লিখিত দেবানন্দ-পুর নিবাসী 'প্রসন্ন ঠাকুরদার' পুত্র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন। কারণ তিনিও শরৎচন্দ্রের সহিত উক্ত অন্নদাদিদির কুটীরে কয়েকবার গিয়াছেন এবং শাহজীর মৃত্যুর পর যে, অন্নদাদিদি শরৎচন্দ্রের পৈতৃক ভবনের নিকটবর্তী চৌমাথা রাস্তার মোড়ের গোবিন্দ মুদির দোকানে মাকড়ী দুইটি বিক্রয় করিয়া যান ও প্রাপ্ত টাকা হইতে শরৎচন্দ্রকে দেওয়ার জন্য পাঁচটি টাকা রাখিয়া যান, তাহা তাঁহার স্পষ্টই মনে আছে।"

দ্বিজেনবাবুর কথা অনুযায়ী অন্নদাদিদির কাহিনী মালিসপুরের বাস্তব ঘটনা হওয়া বিচিত্র নয়। ইন্দ্রনাথের সহিত মাছ চুরি ইত্যাদি কাহিনীগুলি বিহারের, কিন্তু অন্নদাদিদির কাহিনীটি বাঙ্গলা দেশের। অথচ গ্রন্থে দেখা যায়, শরৎচন্দ্র একই জায়গার ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন। পূর্বে যে কথা আলোচনা করেছি—শরৎচন্দ্র কালিদাসবাবুর

কাছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় দেখা ঘটনাসমূহকে একত্র সন্নিবেশিত করার যে কথা বলেছিলেন, এখানে সেরূপ করাও অসম্ভব নয়।

শ্রীকান্ত উপন্যাসে দেখা যায় যে, শ্রীকান্ত পরের বাড়ীতে (পিসির বাড়ীতে) থাকতেন, শরৎচন্দ্রের নিজের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, তিনিও অপরের বাড়ীতে (মামার বাড়ীতে) থাকতেন।

শ্রীকান্ত উপন্যাসে শ্রীকান্তের সন্ন্যাসীদের দলে মেশার কাহিনী আছে। শরৎচন্দ্র নিজেও বহুদিন সন্ন্যাসীদের দলে ছিলেন।

শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্বে শ্রীকান্তের দেশের বাড়ীতে তাঁর পিতার মাতুল বংশের অবস্থানের কথা আছে। শরৎচন্দ্রের নিজের বেলাতেও তাই ছিল। শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় মাতুলালয়ে থাকতেন এবং মাতুলদের বাড়ীর সংলগ্ন তাঁদের দেওয়া ৪ কাঠা জমিতে বাড়ী করেছিলেন। পরে মতিলাল আবার দেনার দায়ে ঐ বাড়ী তাঁর মধ্যম মাতুল অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ২২৫৲টাকায় বিক্রী করেছিলেন।

শ্রীকান্তের দ্বিতীয় পর্বের উল্লিখিত প্রসন্ন ঠাকুরদাও একটি বাস্তব চরিত্র। ইনি পূর্বোক্ত অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক ভ্রাতা।

শ্রীকান্তে বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া ও বক্রেশ্বরের কথা আছে। শরৎচন্দ্র নিজে একবার সাঁইথিয়া ও বক্রেশ্বর গিয়েছিলেন। একথা তিনি বীরভূম নিবাসী শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নকে বলেছিলেন। হরেকৃষ্ণবাবু সেকথা এক প্রবন্ধে লিখেছেন। (ভারতবর্ষ, ১৩৪৪ চৈত্র)

শ্রীকান্ত উপন্যাসে ৪র্থ পর্বে 'খাঁয়েদের গলায় দড়ের' বাগানের উল্লেখ আছে, এটিও দেবানন্দপুরের মুন্সীদের 'গলায় দড়ের বাগান' বলেই মনে হয়। আর শ্রীকান্ত উপন্যাসে বর্ণিত মুরারীপুরের আখড়াটি যে দেবানন্দপুর থেকে তিন চার মাইল দূরবর্তী সরস্বতী নদীর তীরের কৃষ্ণপুর গ্রামের শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর আখড়া, তাতে সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্র ছেলেবেলায় প্রায়ই ঐ আখড়ায় যেতেন। ঐ আখড়া

আজও বর্তমান। ঐ আখড়াটি সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তমুন্সী লিখেছেন—

"এই সময়ে দুই বন্ধুতে (শরৎচন্দ্র ও সতীশচন্দ্র) মিলিয়া সন্ধ্যার পর জেলের ডিঙি চড়িয়া গ্রাম হইতে তিন চার মাইল দূরবর্তী কৃষ্ণপুর গ্রামের শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর আখড়া বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। এই আখড়া বাড়ীর নিকটেই তাঁহাদের সমবয়স্ক 'গফুর' নামে এক মুসলমান বন্ধু ছিল। এবং সে আখড়া বাড়ীতে কীর্তনেও যোগদান করিত। এই গফুরের পিতা-মাতাও অনেকটা হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন। কৃষ্ণপুরের এই আখড়া বাড়ী—শ্রীকান্ত উপন্যাসের চতুর্থ পর্বে 'মুরারিপুরের' আখড়া' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই আখড়া বাড়ী আজও রহিয়াছে।"

এইরূপে আরও অনেক বাস্তব ঘটনা বা কাহিনীর সহিত শ্রীকান্ত উপন্যাসের ঘটনা বা কাহিনীর মিল পাওয়া যায়।

শরৎচন্দ্র ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রেঙ্গুনে ছিলেন। তাঁর ব্যক্তি-জীবনের এই অধ্যায়ের অনেক কথাই আমাদের কাছে অজ্ঞাত। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর রেঙ্গুনের বন্ধুরা এ সম্বন্ধে কিছু কিছু যা লিখেছেন মাত্র।

শুধু রেঙ্গুনের কথাই বা কেন, পড়াশুনা ছেড়ে দেবার পর থেকে রেঙ্গুন যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, শরৎচন্দ্রের জীবনের ঐ সময়ের অনেক কথাও জানা যায় না। ঐ সময় বাড়ী ছেড়ে কোথায় কোথায় তিনি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন. আর কোথায় যে থেকেছিলেন, তারও অনেক কথা জানা যায় না।

তবুও শরৎচন্দ্রের জীবন কথা যা জানা গেছে এবং তা থেকে এখানে যা আলোচনা করা গেল, তাতে দেখা যায় যে, শরৎচন্দ্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে যে লিখেছিলেন—"শেষ পর্যন্ত সব কথাই সত্য

বলা হবে" এবং শ্রীকান্তের আত্মকাহিনীর সঙ্গে কিছুটা সম্বন্ধ ত থাকবেই তা একেবারে মিথ্যা নয়।

এই কারণেই এখন বলা যেতে পারে যে, শ্রীকান্ত উপন্যাসে রাজলক্ষ্মীর কাহিনীটির মধ্যেও কিছুটা সত্য থাকাও একেবারে অসম্ভব নয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তমুন্সী দেবানন্দপুরের প্রাচীন ব্যক্তিদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে রাজলক্ষ্মী সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা এই :—

"তাঁহার (শরৎচন্দ্রের) বিদ্যারম্ভ হয় তাঁহাদের বাটীর নিকটবর্তী প্যারী (বন্দ্যোপাধ্যায়) পণ্ডিত মহাশয়ের পাঠশালায়।...এই পাঠশালায় পড়ার সময় শরৎচন্দ্রের দুটি বিশেষ বন্ধু ছিল—পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্র কাশীনাথ ও গ্রামের এক যাজক ব্রাহ্মণের ভাগিনেয়ী রাজলক্ষ্মী। এই রাজলক্ষ্মী মেয়েটি শরৎচন্দ্র অপেক্ষা দুই তিন বৎসরের ছোট হইলেও সকল সময় তাঁহার সহিত সঙ্গিনীর ন্যায় বেড়াইত। দুইজনে নদীর ধারে বা পুকুরপাড়ে ঝোপের আড়ালে বসিয়া মাছ ধরিতেন, কখনবা ডোঙায় কিম্বা জেলেদের নৌকায় চড়িয়া নদীবক্ষে বেড়াইতেন, কখনও বা উভয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া নানা রঙের ফুল, ছিপের বাঁশ বা ফড়িং সংগ্রহ করিতেন, কখনও বা দুজনে মিলিয়া ঘুড়ি তৈয়ারী করিতেন, কি ঘুড়ির সুতোয় 'মান্‌জা' দিতেন। মেয়েটির একটি খেয়াল ছিল, যখন বৈঁচিফল পাকিত, তখন বৈঁচি ফলের মালা গাঁথিয়া রোজই শরৎচন্দ্রকে উপহার দিত।... শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলার অনেকরকম খামখেয়ালীর কাজে এই রাজলক্ষ্মী মেয়েটি ছিল, তাঁহারপ্রধান উৎসাহদাত্রী ও সহচারিণী। দুজনে মাঝে মাঝে এমন ঝগড়াও হইত যে, দুজনের কথাবার্তা বন্ধ হইত ও মেয়েটি দেখা দিয়াও কথা কহিত না। শরৎচন্দ্র তখন নিজেই যাইয়া মেয়েটিকে আদর করিয়া ডাকিয়া আলাপ করিতেন। এই বাল্যসঙ্গিনী প্রকৃতই যে শরৎচন্দ্রের দেবদাস উপন্যাসের পার্বতী ও শ্রীকান্তের

রাজলক্ষ্মী চরিত্রে অনেকাংশে চিত্রিত হইয়াছে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। এই মেয়েটির তুই বছরের আর একটি বড় ভগিনী ছিল সুরলক্ষ্মী। মেয়ে তুইটির মাতা বিধবা হইয়া তাহাদের লইয়া দেবানন্দপুরে তাঁহার ভ্রাতার সংসারে আসিয়া পড়েন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা সামান্য যাজক ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া আর্থিক অসচ্ছলতা বশতঃ তাঁহাদের ভরণ-পোষণের ভার লইতে পারেন নাই। এজন্য মেয়ে তুইটিকে লইয়া তাহাদের মাতা স্থানীয় এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে দেব-সেবাদি কার্যে ব্রতী হইয়া তথায় আশ্রয় লাভ করেন। মেয়ে তুইটি বিবাহযোগ্যা হওয়ায়, উপায়ান্তর না থাকায়, কোনও এক দূরবর্তী গ্রামের এক কূলীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বাহাত্তর টাকা পণ দিয়া তুইটি মেয়েরই বিবাহ দেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ বিবাহ করিয়া পত্নী তুইটির কাহাকেও নিজ বাটিতে লইয়া যান নাই বা বহুদিন যাবৎ কোনও সংবাদ লন নাই। ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠা সুরলক্ষ্মীর মৃত্যু হয় ও তাহার কিছুদিন পরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অন্তিম শয্যায় শায়িত হইয়া যখন পত্নীদের কাহাকেও লইয়া যাইতে লোক পাঠান, তখন রাজলক্ষ্মীকে স্বামীর ভিটায় যাইতে হয়। কিন্তু অল্পকাল পরেই স্বামীর মৃত্যু ঘটায় আবার দেবানন্দপুরেই মাতার নিকট ফিরিয়া আসে। ইহার বছর খানেকের মধ্যেই রাজলক্ষ্মীকে লইয়া তাহার মাতা কাশীধামে গমন করেন ও পরে যখন তথা হইতে ফিরিয়া আসেন, তখন শুনা যায় যে, রাজলক্ষ্মীর কাশীধামে মৃত্যু হইয়াছে। রাজলক্ষ্মীই যে ‘পিয়ারী বাঈজী’ হয় নাই, তাহা বলা যায় না।” (দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবন)

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, দ্বিজেনবাবু রাজলক্ষ্মীর বাল্যজীবনের যে ইতিহাস দিয়েছেন, শ্রীকান্তে বর্ণিত রাজলক্ষ্মীর বাল্যজীবনের ইতিহাসের সঙ্গে তা অনেকটা মিলে যায়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, দ্বিজেনবাবুর বর্ণিত রাজলক্ষ্মীর বাল্য-

জীবনের কাহিনীটি ঠিক কিনা? দ্বিজেনবাবুর বর্ণিত কাহিনীটি যে সত্য নয়, তা জোর করে বলা যায় না। কেন না অনেক বাস্তব নাম, ধাম, এমনকি ছোট ছোট ঘটনাও ত শরৎচন্দ্র তাঁর অনেক গ্রন্থে সন্নিবেশিত করছেন।

রাজলক্ষ্মীর বাল্যজীবনের ইতিহাস না হয় গেল, কিন্তু যেটি আসল কাহিনী অর্থাৎ রাজলক্ষ্মীর সহিত শরৎচন্দ্রের প্রণয়-কাহিনী তার মধ্যে কি কোনও সত্য নেই?

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, শরৎচন্দ্র বাঙ্গলা, বিহার এবং ব্রহ্মদেশ ভালভাবেই ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। জীবনে বহু লোকের সঙ্গে মিশে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। আর তিনি যে প্রকৃতির ছন্নছাড়া ও ভবঘুরে মানুষ ছিলেন, তাতে করে এই ধরণের কোন বাঈজীর পাল্লায় পড়া বা অন্ততঃ বাস্তবেও ঐরূপ বাঈজী দেখা তাঁর পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয়।

শরৎচন্দ্র হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মশায়ের কাছে একবার বলেছিলেন—রেঙ্গুনে যাওয়ার পূর্বে তিনি কিছুদিন বনেলী এস্টেটে চাকরি করেছিলেন। তখন সাঁওতাল পরগণায় সেটেলমেণ্টের কাজ চলছিল। এস্টেটের তরফ থেকে ঐ সময় তাঁকে কিছুদিন সেখানে থাকতে হয়েছিল। এস্টেটের আরও কয়েকজন অফিসারও সেখানে ছিলেন। ডাঙ্গার উপরে ক্যাম্প পড়েছিল, সকলে সেই ক্যাম্পে থাকতেন। মাঝে মাঝে বনেলী এস্টেটের কুমার বাহাদুরও জমিদারীর মধ্যে সেটেলমেণ্টের কাজ দেখবার জন্য সেখানে যেতেন। তাঁর পৃথক ক্যাম্প হ'ত। তিনি তাঁর ক্যাম্পে মাঝে মাঝে নাচ-গানের ব্যবস্থা করতেন।

শ্রীকান্ত উপন্যাসেও দেখছি, এক কুমার বাহাদুরের ক্যাম্পে নাচ-গানের আসরেই রাজলক্ষ্মীর সহিত শ্রীকান্তের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের জীবনীতে আরও দেখা যায় যে, তিনি বনেলী এস্টেটে চাকরি করতে করতেই কা'কেও কিছু না বলেই উধাও হয়েছিলেন এবং কিছুদিন কোথায় ঘুরে শেষে সন্ন্যাসী সেজে মজঃফরপুর গিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র যে কুমার বাহাদুরের নাচ-গানের ক্যাম্পে কোন বাঈজীর দেখা পান নি, বা তার সঙ্গে কোনরূপ মেলা-মেশা করেন নি, তা জোর করে বলা যায় না। বরং দেখা পাওয়া ও তার সঙ্গে পরিচিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই শরৎচন্দ্রের জীবনে রাজলক্ষ্মী বাস্তবে না ঘটলেও তিনি একজন বাঈজী দেখে বা তার সঙ্গে কিছুদিন মেলামেশা করে তার উপর রং চড়িয়ে যে রাজলক্ষ্মী চরিত্র চিত্রিত করেছেন, তাতে আদৌ সন্দেহ নেই।

বিখ্যাত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারও দৃঢ় বিশ্বাসের সহিতই রাজলক্ষ্মীকে একটি দেখা চরিত্র বলেছেন। মোহিতবাবুর সেই উক্তিটি উদ্ধৃত করেই এখন রাজলক্ষ্মী প্রসঙ্গ শেষ করছি :—

"আর ঐ রাজলক্ষ্মীর কথা! যাঁহারা এই কাহিনী—শুধুই রসতত্ত্ব নয়, সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্বের দিক দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের সন্দেহ থাকিবে না যে, শ্রীকান্তের আত্মকাহিনীতে রাজলক্ষীর চরিত্র কত সত্য, কত বাস্তব। ঐ চরিত্র যদি বাস্তব না হয়, তবে সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্বই মিথ্যা। কোন কবি, এমন কি সেক্সপিয়ারও বোধ হয় এতখানি কল্পনাশক্তির অধিকারী ছিলেন না যে, চোখে না দেখিয়া এইরূপ একটা চরিত্র সৃষ্টি করেন।"